গোধূলি

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬০

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—বরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

দেশবাণী মুদ্রণিকা

৮ বি, ডি, এল, রায় স্ট্রীট

কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

আড়াই টাকা

শ্রীপারুলবালা ঘোষ

করকমলেষু

এই লেখকের ঃ

উল্টোরথ

চড়াই-উৎরাই

পতাকা

শ্রেষ্ঠ গল্প

কাঠ গোলাপ

*

দ্বীপপুঞ্জ

অক্ষরে অক্ষরে

দেহমন

দূরভাষিণী

সঙ্গিনী

চেনা মহল

অনুপমের স্ত্রী ইন্দুলেখা অবশ্য আপত্তি করেছিল, 'অত চড়া রঙ কি ভালো, তার চেয়ে শাদা রঙ করাও বেশ মানাবে।' অনুপম মুখ বাঁকিয়ে বলেছিল, 'হুঁ তোমার যেমন পছন্দ। শাদা রঙ আবার একটা রঙ নাকি।'

স্ত্রীর রুচি আর পছন্দেব ওপর কোনদিনই তেমন আস্থা নেই অনুপমেব। ঘরের আসবাবপত্র থেকে শুরু ক'রে নিজেদের পোষাক-পরিচ্ছদ, ছেলেমেয়েদের জামাজুতোর প্যাটার্ন, রঙ পর্যন্ত অনুপম নিজে পছন্দ না ক'বে দিলে চলে না, যেটা সে নিজে না দেখে সেটাই বেমানান হয়, আর তার মন খুঁৎ খুঁৎ করে।

আসবাবপত্রেব দিকেও ভাবি ঝোঁক অনুপমের। বৈঠকখানার বাজারে অনুপমের ছেলেবেলার সহপাঠী ভূপেন রক্ষিত ফার্ণিচারের ব্যবসা কবে। টেবিল, চেয়াব, আয়না, আলমারী বছর বছর কিছু না কিছু সওদা তার দোকানে বাঁধা। নগদ অবশ্য পুরো দামটি দেওয়া হয় না, কিছু বাকি থাকে, কিছু কিস্তিতে কিস্তিতে শোধ হয়। কোন কোন কিস্তি খেলাপও যায়। ভূপেনের মুখের দিকে তখন তাকানো যায় না। কিন্তু অনুপমের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

ইন্দুর এতটা ভালো লাগে না, মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলে, 'কেবল যে জিনিসপত্র দিয়ে ঘর ভরছ, ঘরে কি কেবল তোমার জিনিসই থাকবে, আমরা থাকব না ?'

অনুপমও বিরক্ত হয়, 'বেশ তো, না থেকে যদি পার না থাকলে, সংসারী লোক মাত্রেরই জিনিসপত্র দরকার হয়। সবাইতো আর তোমার মত সন্ন্যাসিনী হয়ে জন্মায় না ?'

স্ত্রীর সাদাসিধে অনাড়ম্বর ধরণটিকেই অনুপম বলে সন্ন্যাস।

আসবাবপত্রের মত ফুলের বেশ সখ আছে অনুপমের। দোতালার ওপর দক্ষিণখোলা ছাদ আছে একটু। অনুপম কার্নিশের ধার দিয়ে

চারদিকে দেশী-বিদেশী ফুলের টব সাজিয়েছে। আরো কোথায় কি অঙ্গসজ্জা কম খরচে সম্ভব হয়, কোথায় কতটুকু অদল-বদল করলে বাড়িটির সৌন্দর্য, সৌষ্ঠব আরও বাড়ে--অবসর পেলে স্ত্রীর সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা করাটা অনুপমের আর এক বিলাস।

ইন্দু বলে, 'কি যে শুরু করেছ তুমি। তবু যদি নিজের বাড়ি হোত—'

অনুপম বলে, 'তাহলে মারবেল ফলকের অক্ষরগুলি মুছে ফেলে এ বাড়ির নাম রাখতুম 'অনুপম-ধাম'।' একটু থেমে চিন্তা করে বলে, 'কিম্বা 'ইন্দু-বিতান'।'

ইন্দু বাধা দিয়ে বলে. 'থাক থাক, ইন্দু-বিতানে আর কাজ নেই, অনুপম-ধামের চোটেই অস্থির।'

'ভূপতি-ভবনের' সবখানিই অবশ্য নিজের বসবাসের জন্য দখলে রাখেনি অনুপম। দোতলার দুখানা ঘর নিজের জন্য রেখে, একতলার দু'খানায় ভাড়াটে বসিয়েছে। সংসারে একটি ছেলে, একটি মেয়ে আর নিজেরা স্বামী-স্ত্রী। গোটা বাড়ি দিয়ে কি হবে। তা'ছাড়া গোটা বাড়ি রাখবার জোরই বা কই। পাঁচ বছর আগে এই বাড়ি যখন নেওয়া হয় তখন পুরো শ'খানেক টাকাও মাইনে ছিল না অনুপমের। এখন অবশ্য এ-অফিস সে-অফিস ঘুরে আয় দু'শোর ওপরে উঠেছে। কিন্তু জিনিসপত্রের দাম যা চড়েছে, তার কাছে এই আয়বৃদ্ধির অনুপাত কিছুই নয়। ফলে ভাড়ার কুড়িটা টাকাও বেশ হিসেবের মধ্যে ধরতে হয়।

সপ্তাহখানেক হোল একতলার ভাড়াটেরা উঠে গেছে। নতুন ভাড়াটে এখনো নেওয়া হয়নি। কিন্তু আসবার জন্য নতুন ভাড়াটেদের ব্যস্ততার সীমা নেই। এমন দিন যায় না যেদিন দু'তিনজন ক'রে

লোক ঘরের খোঁজে না আসে। শুধু হাতে নয়, সুপারিশ চিঠি পর্যন্ত সংগ্রহ ক'রে আনে। কেউ অনুপমের ভূতপূর্ব অফিসের সহকর্মীর ভাইপো, কেউ বা পাড়ার ডাক্তার বাবুর ভাগ্নে। কিন্তু অনুপমের আশা একটু বেশি। এবার শ'দুই টাকা সে বাড়ি মেরামতের খরচ বাবদ চায়। সেলামী কথাটা ভাল না। সবাই যখন চায় সবাই যখন পায় সেই বা বাদ যাবে কেন?

চেহারা দেখে, দু'-চারটে কথাবার্তা বলে কাউকে বা আগেই বিদেয় করে অনুপম, সরাসরি বলে, 'ঘর খালি নেই, ভাড়া হ'য়ে গেছে।'

ইন্দুলেখা বলে, 'ছি-ছি-ছি, কেন মিছামিছি মিথ্যে কথাগুলি বল। তার চেয়ে বলে দিলেই হয় ঘর ভাড়া দেব না।'

অনুপম বলে, 'সেও তো মিথ্যা কথা। ঘর ভাড়া তো দেবই।'

ইন্দু বলে, 'তা'হলে দিয়ে দাও বাপু, লেঠা চুকে যাক। রাজ্যের লোক সারা দিন এসে বিরক্ত করে। আর ভালো লাগে না।'

অনুপম বলে, 'হুঁ, এখন এই কথা বলছ। কিন্তু না দেখে, না শুনে বেশি লোকজন-ওয়ালা কাউকে ভাড়া দিয়ে বসি তাও তখন খারাপ লাগবে। রাতদিন তখন ফের সেই প্যান-প্যান ঘ্যান-ঘ্যান শুরু হবে।'

কথাটা মিথ্যা নয়, এর আগের ভাড়াটে ছিলেন বিপিনবাবুরা। তাঁদের ছেলেপুলের সংখ্যা ছিল আট, স্বামী-স্ত্রী দু'জন ছাড়াও বিপিনবাবুর মা আর পিসিমা ছিলেন। লোক ধরত না বাড়িতে। এমন দিন যেতনা, যেদিন কল, চৌবাচ্চা, ছাদে কাপড় শুকানো কি কিছু একটা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথান্তর, মতান্তর না হোত। শেষ পর্যন্ত তাঁরাই সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে উঠে গেছেন।

কিন্তু তাই বলে কি যারা ঘর ভাড়া নিতে আসবে তাদের কাছে মিথ্যা কথা বলতে হবে। কি দরকার, নিজেদের বাড়ি নয়, কিছু

নয় অনর্থক ছলচাতুরীর দরকার কি লোকের সঙ্গে। আর একতলার এই ঘরের জন্য দেড়শ দুশো সেলামীই বা লোকে দেবে কেন। চাইতেই তো লজ্জা করা উচিত অনুপমের। এ-নিয়ে স্বামীর সঙ্গে ইন্দুর প্রায়ই তর্কবিতর্ক হয়।

অনুপমেরও যুক্তির জোর কম নয়। সে বলে, 'ওই টাকা নিয়ে কি আমি দুধ-মাছ কিনে খাব, না জামা-জুতো কিনব। ও টাকা বাড়ি মেরামতেই লাগবে। টাকাটা পেলে বাড়ির আমি ভোল ফিরিয়ে দেব। আর একটা বাথরুম, পায়খানা করাব। যারা আসবে তাদের সুবিধা হবে। আমার একার সুবিধার জন্য তো নয়। দেবে না কেন।'

ঘর ভাড়া দেওয়া নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে জল্পনা-কল্পনা তর্কবিতর্ক চললেও, পুরোন ভাড়াটেরা উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুপমের দুটি ছেলেমেয়ে দু'খানা ঘরই দখল করেছে। ফের ঘর দু'খানা অন্য কাউকে ভাড়া দেওয়া হয়, মোটেই ইচ্ছা নয় তাদের। তিলু তো ইন্দুকে স্পষ্টই বলে দিয়েছে, 'ভাড়া দিলে ডান দিকের ঘরখানা দিয়ো, মিনু ওঘরটাকে পুতুল খেলে নষ্ট করেছে, কিন্তু আমার ঘর আমি ছাড়ছিনে, এটায় আমাদের ক্লাবের অফিস বসবে।'

তিলুর বয়স নয়, ফাইভে পড়ে। পাঁচ বছরের মিনুকে এখনো স্কুলে দেওয়া হয়নি, কিন্তু বেণী-দুলিয়ে সে রোজ স্কুলে যাওয়ার বায়না ধরছে। সেও তার নতুন দখল করা ঘর ছেড়ে দিতে রাজি নয়, তার ছেলেমেয়েগুলি থাকবে কোথায় তা'হলে।

ইন্দু একবার বলেছিল, 'কেন, খাটের তলায় আর সিঁড়ির নিচে তো দিব্যি এতদিন তোমার ছেলেমেয়েরা খেয়েছে ঘুমিয়েছে।'

মিনু ঠোঁট উল্টে জবাব দিয়েছিল, 'বাঃ রে, এখন ওরা বড় হ'য়েছে

যে, বিয়ে করেছে। এখন বড় ঘর না হ'লে চলে? তুমি কিচ্ছু বোঝ না মা।'

ইন্দু স্বামীর দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলেছিল, 'তাইতো তোমার নাতি নাতবউকেই ঘরখানা তা' হলে ছেড়ে দিতে হয়।'

ভাড়াটে নির্বাচন সম্বন্ধেও মিনু মাঝে মাঝে তার বাবাকে পরামর্শ দেয়; ঘর সম্পর্কে লোকে যখন তার বাবার সঙ্গে আলাপ করে, মিনু একপাশে দাঁড়িয়ে চুপ ক'রে তাদের দিকে চেয়ে থাকে। কেউ কেউ ঘর দেখে, কেউ বা বাইরে থেকেই চলে যায়। মিনু তখন তার মতামত প্রকাশ করতে থাকে, 'ও লোকটাকে নিয়োনা বাবা, ও তেতালা, তো তো করে।' 'ও-লোকটা যেন না আসে বাবা। ভারি কালো, দেখতে কি বিশ্রী, মাগো!'

ইন্দু মেয়েকে শুধরে দেয়, 'লোকটা লোকটা কোরোনা মিনু, ভদ্রলোক বলতে হয়।'

'হুঁ, ভদ্রলোক না আরো কিছু, দেখতে কালো, মুখটা বাঁকা—'

অনুপম হাসে, 'আমি কি জামাই নিচ্ছি নাকি মা, যে সুন্দর দেখে বেছে বেছে নেব।'

জামাই কথাটার খানিকটা অর্থ মিনু আন্দাজ করতে পেরে বলে, 'যাঃ।'

ইন্দু তখন মেয়ের পক্ষ নেয়, মিনু কিন্তু একেবারে মিথ্যা বলেনি, সৎ অসৎ ভালো মন্দ অনেক সময় লোকের চেহারা দেখেই বোঝা যায়।

অনুপম বাধা দিয়ে বলে, 'থাক থাক, তোমার আর তত্ত্বকথা শুরু ক'রে কাজ নেই। তুমি মুখ খুললেই আমার ভয় হয়, কখন ছাপার অক্ষর ঝরে পড়বে! রাজ্যের নাটক নবেল পড়ে পড়ে মুখখানাকে ছাপাখানা বানিয়েছ। বেশ তো, ও সব তত্ত্বটত্ত্ব ছেড়ে সোজা কথায়

বললেই তো হয়—কেবল মিনুই নয়, মিনুর মারও ইচ্ছা বেশ সুন্দর অল্পবয়সী ভাড়াটে একজন আসে বাড়িতে।'

ইন্দু অপ্রতিভ হয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে বলে, 'আহা-হা নিজের চেহারাখানা খুব সুন্দর কি না, সেই গর্বে মাটিতে পা পড়তে চায় না। বিশ্ব-দুনিয়ায় এমন সুপুরুষ কি আর দুটি আছে?'

অনুপম সদম্ভে জবাব দেয়, 'নেই-ই তো, আমার চোখে তো পড়েনি। তোমার চোখে পড়ে থাকলে সে কথা স্বতন্ত্র।'

অনুপম সত্যিই বেশ সুপুরুষ। বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে, কিন্তু আকৃতিপ্রকৃতিতে তা মোটেই বোঝা যায় না। দীর্ঘ ছ' ফুট দেহ। প্রৌঢ়ত্বের দু'চারটে রেখা গালে কপালে ফুটে উঠলেও শরীর অনুপমের যেমন ঋজু তেমনি মজবুত। কৃচ্ছ্রতা যথেষ্ট গেছে দেহের ওপর দিয়ে। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত খেলায়, সাঁতারে সুগঠিত দেহের বাঁধুনী এখনো শিথিল হয় নি। মাথার ঘন কালো মসৃণ চুল সযত্নে আচড়ান, গায়ের রঙ সুগৌর, চওড়া কপাল। ঠোঁটটা একটু অবশ্য পুরু। সে ঠোঁটে মাঝে মাঝে গোঁফ থাকে, মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়। অনুপম গোঁফ সম্বন্ধে এখনো অস্থিরচিত্ত। ইন্দু বলে, 'গোঁফ না পাকা পর্যন্ত তোমার বুদ্ধি পাকবে না।'

অনুপমের তুলনায় ইন্দুর রঙ ময়লা, শ্যামবর্ণ ঘেঁসা। নাকও অমন চোখা নয়। কিন্তু চোখ দুটি সুন্দর, যেমন বড় তেমনি কালো আর গভীর, কোমল চিবুক, হাসলে তার মাঝখানকার তিলটি যেন নড়তে থাকে। সব মিলে ভারি মিষ্টি আর মোলায়েম মুখের ডৌলটি। বয়স সবে ত্রিশ উত্তীর্ণ হয়েছে। মুখ দেখে হঠাৎ ধরা না পড়লেও একটু লক্ষ্য করলে গোপন থাকে না। গোপন করবার জন্য ইন্দুর চেষ্টাও নেই, ইচ্ছাও নেই, বরং মনে হয় সৌখ্যে, বাৎসল্যে, গাম্ভীর্যে, মাধুর্যে এই একত্রিশ

বছর বয়সটা ইন্দুলেখার আকৃতি-প্রকৃতির সঙ্গে সব চেয়ে ভালো মানিয়েছে।

নিজের রূপ সম্বন্ধে অনুপম যেমন আত্মসচেতন, রূপচর্চা সম্বন্ধেও তেমনি। মাথার চুল থেকে জুতোর পালিশের মসৃণতা পর্যন্ত বেশে-বাসে অনুপমের সমান লক্ষ্য আছে। আচ্ছাদনটা যাতে বেশ একটু মিহি, দামী ভদ্রজনের মত হয় সে সম্বন্ধে অনুপমের চেষ্টার ত্রুটি নেই। আয়-ব্যয়ের অনুপাত হয় তো এতখানি পারিপাট্যকে সমর্থন করতে চায় না। কিন্তু এ নিয়ে ইন্দু কোন মন্তব্য করলে অনুপম রেগে ওঠে, 'কেন আমার বাবুগিরির জন্য তোমরা কি কেউ উপোস ক'রে আছ? কি খাই না খাই তা পাঁচজনে দেখতে আসে না, কিন্তু কি প'রে বেরোই তা সবাই লক্ষ্য করে। পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে হয়, ভদ্রতা বজায় রাখতে হলে যেটুকু দরকার আমি কি তার এক চুলও বেশি করি? অবশ্য যদি সাধ্য থাকত তাহলে করতামই-তো, তোমার মত মিশনারী মেম সেজে থাকতাম না।'

বেশভূষা সম্বন্ধে ইন্দুর ঔদাসীন্যকে সুবিধা পেলেই অনুপম খোঁচা দিতে ছাড়ে না। আগেকার দিনে খোঁচাগুলির তীব্রতা ছিল বেশি, ইন্দুর মন নরম থাকায় বিঁধতও সহজে। আজকাল এ সব মত-বৈষম্য, রুচি-বৈষম্য লক্ষ্য করবার বড় সময় হয় না, সুযোগও আসে না। অন্ন-বস্ত্রের দাবি মেটাতে অনুপম সারাদিন ব্যস্ত থাকে। চাকরি ছাড়াও সুবিধা পেলেই এখানে ওখানে দুটো একটা পার্ট-টাইম করে, টাকাটা বেশির ভাগই পরের দেনা শোধ করতে যায়। চাল ডাল তেল নুণ, কাপড়, কয়লার কোথায় কতটুকু মিতব্যয়িতা সম্ভব ইন্দুলেখাকে সে সম্বন্ধে সদাসর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়। অনুপম ইন্দুর গৃহিণীপণার তারিফ করে, স্ত্রীপুত্রের ভরণ-পোষণে তার অনলস পরিশ্রমের জন্য ইন্দুলেখাও কৃতজ্ঞ থাকে।

অক্লান্ত শ্রমী অনুপমকে সেবা যত্ন পরিচর্যা দিয়ে সানুরাগ কৃতজ্ঞতা জানায় ইন্দুলেখা।

তবু মতভেদ ব্যক্তিগত কর্তৃত্বরক্ষার জেদ যে তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে একেবারেই দেখা দেয় না, তা নয়। এই একতলার নতুন ভাড়াটে নির্বাচন নিয়েই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সেদিন বেশ একচোট কথান্তর হয়ে গেল।

অফিস থেকে ফিরে এসে হাতমুখ ধুয়ে স্ত্রীর রান্না ঘরের সামনে ছোট জলচৌকিটায় বসে আলুর তরকারি দিয়ে পরোটা খেতে খেতে সেদিন অনুপম হঠাৎ বলল, 'দেখ, ও সব সেলামী টেলামী ছেড়েই দিলুম।'

কেটলী থেকে কাপে চা ঢালছিল ইন্দু, স্বামীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'মানে দ্রাক্ষাফল টক। সেলামী পাচ্ছনা তাই ছেড়ে দিচ্ছ।'

অনুপম বলল, 'পাচ্ছিনে মানে? ভজুবাবু বিধুবাবুকে মুখের কথাটি বললেই একশ টাকার দু'খানা নোট এখনই পায়ের ওপর রেখে দেন। কিন্তু তাই বলে আত্মীয় কুটুম্বের কাছে তো আর পীড়াপীড়ি করা যায় না। চিনুর কাছে কথাটা তুলতেই পারলাম না। বাইরের লোকে তো আর বুঝবে না যে, ও টাকা আমি বাড়িটা মেরামতের জন্যই নিচ্ছি, তারা মনে করবে এতে বউয়ের গয়না গড়াব।'

ইন্দু বলল, 'চিনু মানে? কোন চিনু?'

অনুপম একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'আর ক'জন চিনুকে তুমি চেন শুনি? চিনু আমাদের চিন্ময় দত্ত, বিমলের খুড়তুতো ভাই।'

বিমল অনুপমের ভগ্নীপতি।

গাঁয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে দুই পরিবারেরই যাতায়াত

ছিল। অনুপম বলল, 'তা ছাড়া, তোমার বাপের বাড়ির দিক থেকেও তো চিনুদের সঙ্গে কি এক কুটুম্বিতা রয়েছে।'

ইন্দু বলল, 'হাঁ, তা আছে, চিনুর মা আমার পিসিমার জা। একবার আমাদের ওখানে মাসখানেক ছিলেন।'

অনুপম বলল, 'সেদিন প্রিমিয়াম জমা দিতে এসেছিল আমাদের অফিসে। কথায় কথায় বলল, 'অনুপমদা, দু'খানা ঘর দিতে পারেন?' শুনলুম মহামুস্কিলে পড়েছে। পাকিস্তানের হুজুগে খবরবার্তা না দিয়ে কোন এক প্রতিবেশীর সঙ্গে চিনুর মাও এসে পড়েছেন কলকাতায়। থাকবার জায়গা নেই। প্রথমে উঠেছিলেন সেই প্রতিবেশীর ওখানে। সেখানে ক'দিন আর থাকতে পারেন। চিনু তো খুব রাগারাগি করেছে মাকে। তারপর বেরিয়েছে ঘর খুঁজতে। কিন্তু খুঁজলেই তো আর কলকাতা শহরে ঘর মেলে না আজকাল।'

ইন্দু বলল, 'সে তো ঠিকই, তারপর?'

অনুপম বলল, 'তারপর ভেবে চিন্তে দিয়েই ফেললাম কথাটা। কুটুম্ব মানুষ ভারি কষ্ট হোল শুনে। অবশ্য কিছু টাকা লোকসান হোল। কিন্তু টাকাটাই তো সংসারে সব নয়, আত্মীয়-স্বজনের কাছে মান-মর্যাদাও তো রাখতে হয়। বুলিকে বলতে পারব,—দেখ তোর মাসিশাশুড়িকে আমি স্থান দিলুম বলেই ঠাঁই পেলে। না হলে যা দিনকাল আজকাল, গঙ্গায় সাঁতার কেটে বেড়ান ছাড়া আর উপায় ছিল না।'

ইন্দু শঙ্কিতভাবে বলল, 'কথা একেবারে পাকাপাকি করে এসেছ নাকি?'

অনুপম বলল, 'তবে কি। আমি যা করি তা পাকাপাকি করেই করি। তোমাদের মত একবার এগোই, একবার পেছোই না। চিন্ময় আমাকে পঁচিশ টাকা এডভান্সও করেছে। ওর বুদ্ধিতে অবশ্য

কুলোয়নি। আমিই ইঙ্গিত দিলুম। বললুম, 'কথাটা তা' হলে একেবারে পাকা করেই নাও ভায়া। কখন আবার কে এসে ধরে পড়বে, আমার এড়াবার জো থাকবে না।'

ইন্দু গম্ভীর ভাবে বলল, 'এড়াবার জো আমারও নেই।' আজ বিকালে আমিও চক্রবর্তীদের মাসিমাকে কথা দিয়ে ফেলেছি।'

অনুপম বলল, 'কথা দিয়ে ফেলেছ? তার মানে?'

ইন্দু বলল, 'না দিয়ে করি কি, বামুনের মেয়ে দু'খানা হাত ধরে পড়লেন, প্রায় পায়ে ধরবার জোগাড়। তাঁর এক ভাইপো বরিশাল থেকে স্ত্রী, ছেলেপুলে মা বোন নিয়ে তাঁর বাড়িতে এসে উঠেছেন। অথচ বাড়িতে তিল ধারণের জায়গা নেই। ছাদে শুয়ে শুয়ে দুটি ছেলের নাকি এরই মধ্যে নিমনিয়া হয়েছে। মাসিমা বললেন, 'যেভাবে পারো ঘর দুখানা আমাকে দিতেই হবে বৌমা।'

অনুপম বলল, 'তবে আর কি। দিতে হবে বললেই একেবারে দিয়ে দিলে? টাকা ঠাকা কিছু নিয়েছ?'

ইন্দু একটু লজ্জিত সুরে বলল, 'না, তা নিইনি, টাকা কাল তিনি সকালে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু টাকাটাই তো সংসারে সব নয়। পাড়াপড়শীকে মুখের কথা যখন দিয়ে ফেলেছি, আমি আর তা ফেরাতে পারব না। চিন্ময়কে তার টাকা তুমি বরং কাল ফেরৎ দিয়ে এস। আত্মীয়স্বজন মানুষ, বুঝিয়ে একটু বললেই হবে। তা ছাড়া মাসিমার ভাইপো রমেন বাবু যেমন বিপদগ্রস্ত, চিন্ময় দত্তের তো তত অসুবিধা নেই। তার এক মা। একখানা ঘর তাকে খুঁজে দেওয়া যাবেই।'

অনুপম ততক্ষণে গরম হয়ে উঠেছে, 'তার মানে তোমার মুখটাই মুখ, আর আমার মুখটা তো মুখ নয়—আচ্ছা তোমার সাহসটা কি শুনি?'

ইন্দুরও জেদ কম নয়, বলল, 'কেন ভয়ের এমন কি পড়েছে? কি এমন অন্যায় বলেছি আমি?'

অনুপম বলল, 'না অন্যায় কেন, তুমি একেবারে ন্যায়ের শিরোমণি। নিজের আত্মীয় কুটুম্বকে ঘর ভাড়া দেব না, তাদের বিপদে আপদে দেখব না, যত কুটুম্বিতা তোমার পাতানো মাসিমার সঙ্গে, আর বাইরে বেরিয়ে রোজ হাজার জনকে যাকে মুখ দেখাতে হয় তার মুখের কথার দাম নেই, ঘরের কোণের মেয়েমানুষের মুখের কথার দামই বেশি।'

ইন্দু বলল, 'তার তুমি বুঝবে কি। যার যার কথার দাম তার তার কাছে।'

অনুপম মাথা নেড়ে বলল, 'না, তা নয়, স্ত্রীর কাছে স্বামীর কথার দাম নিজের কথার চেয়ে বড়। চিন্ময়কে টাকা ফেরৎ দিলে তার কাছে ফের আমি মুখ দেখাব কি করে? তা ছাড়া কেবল সেই তো নয়, তার কে একজন বন্ধু ছিল সঙ্গে, আমার কলিগরা ছিল, সবাইর সামনে আমি বেল্লিক বনি এই তোমার ইচ্ছা, না?'

চায়ের কাপটা স্বামীর হাতে তুলে দিতে দিতে ইন্দু গম্ভীর ভাবে বলল, 'বেশ তাহ'লে তোমার কথাই থাকবে।'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে এবার অনুপম একটু হাসল, 'বাঃ, ভারি চমৎকার হয়েছে তো আজকের চা-টা।'

কিন্তু ইন্দুর মুখে হাসির প্রতিবিম্ব পড়ল না দেখে অনুপম আবার বিরক্ত হয়ে উঠল, 'কি হোল, তাই বলে হাঁড়ির মত করে রাখলে কেন মুখখানাকে। ভয় নেই কেবল আমার মুখই নয়, তোমার মুখরক্ষার ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে করব। তোমার কিছু বলতে হবে না, চক্রবর্তীদের মাসিমাকে আমিই সব বুঝিয়ে বলে দেব। তাঁর ভাইপোর ছেলেদের নিমুনিয়া হয়েছে, আমার কুটুম্বের ছেলে মেয়েদের টাইফয়েড, কালাজ্বরের এমন গল্প ফাঁদব যে, তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরোবে, মুখ দিয়ে কথা সরবে না। তোমার কোন চিন্তা নেই।'

ইন্দু বলল, 'না, আমার কোন চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। যা বলবার আমিই তাঁকে বলব, তুমি ভাব ছুনিয়াশুদ্ধ লোক সব তোমার মত।'

অনুপম বলল, 'কিন্তু ছুনিয়াশুদ্ধ লোক যে তোমার মত ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সে কথাও ভেব না। আরে সেই যুধিষ্ঠিরকেও তো দায়ে পড়ে মিথ্যে কথা বলতে হয়েছিল, সবই আমার জানা আছে।'

ইন্দু কোন কথা না বলে বঁটিতে বেগুন কুটতে শুরু করল।

অনুপম বলল, 'তা ছাড়া ছুশো টাকার সেলামী কি আমি না ভেবে চিন্তে সহজে ছেড়ে দিয়েছি মনে করো? কথা দেওয়ার আগে ছু তিন মিনিটের মধ্যে সব হিসেব করে দেখেছি। হিসাব ছাড়া কোন কাজ করবার মানুষ আমি নই। চিন্ময়রা এলে সুবিধা হবে কত, প্রথম তো ওই মা আর ছেলে, ভিড় নেই, ঝামেলা নেই। ভাড়াটে এলেও মনে হবে না যে ভাড়াটে এসেছে। তারপর নিজে কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকি, ছেলেমেয়েগুলির পড়াশুনাটা কিছুই দেখতে পারিনে, চিন্ময়কে দিয়ে সে কাজও হবে। সকালে-বিকালে—'

অনুপম একটু থামল, আর একবার তাকিয়ে দেখল স্ত্রীর নির্বিকার শান্ত গম্ভীর মুখের দিকে, তারপর বলল, 'আর এক কথা শুনলুম, চিন্ময়ও নাকি তোমার মত বইয়ের পোকা, সে তো তুমিও জানো প্রফেসর মানুষ বইপত্র নিয়েই তো কারবার। যখন আসবে, গোটা ছুয়েক বইয়ের আলমারী কোননা সঙ্গে আনবে। তা ছাড়া সন্ধ্যা বেলা পাড়ার লাইব্রেরী থেকে তোমার বই আনা-নেওয়া কাজটাও বেশ চলবে চিন্ময়কে দিয়ে।'

ইন্দু একটু হাসল এবার, 'কেবল কি তাই? তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের টবে জল দেবে, বাজারের থলে নিয়ে যাবে পিছনে পিছনে,

ছুটির দিনে দু চার হাত দাবাও খেলতে পারবে তার সঙ্গে; আরও কি করবে না করবে ভেবে চিন্তে হিসেব করে রাখো।'

দিন দুই বাদে বেলা গোটা নয়েকের সময় একখানা ঘোড়ার-গাড়ি এসে 'ভূপতি-ভবনের লাগা গ্যাসপোস্টটার ধারে থামল। গাড়ির মাথায় ট্রাঙ্ক, বাক্স, পোঁটলা-পুঁটলি, বিছানার বাণ্ডিল। পিছনে পিছনে ঠেলাগাড়িতে বাজে কাঠের খানদুই তক্তপোষ, একজোড়া ছোট টেবিল চেয়ার আরো সব টুকিটাকি গৃহস্থালীর আসবাব।

পাড়ার গুটি তিন-চার ছেলে ছুটে এল পিছনে পিছনে, 'ও তিলু দেখ এসে তোদের নতুন ভাড়াটে এসেছে।'

তিলু মিনু সিঁড়ি বেয়ে ছুটে নামল নিচে। ইন্দুলেখা রান্নাঘরে ছিল। সেখান থেকে বেরুল না। কিন্তু শোয়ার-ঘর থেকে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এল অনুপম। সারামুখ সাবান মাখা। ক্ষৌরী হতে বসেছিল। ইন্দুকে ডেকে বলল, 'চিনুরা বোধ হয় এল। শুনছ না কি? রান্না তো তোমার সারা সকালই আছে। এবার একটু নিচে যাও। মাঐমা এসেছেন। গিয়ে এগিয়ে নিয়ে এস।'

ইন্দু ঘরের ভিতর থেকে বলল, 'আমার হাত আটকা, তুমি গেলেই চলবে।'

অনুপম বলল, 'না-না-না, তাই কি হয়, তুমিও এস, কুটুম্বমানুষ। ভদ্রতা বলে একটা জিনিসও তো আছে।'

ইন্দু বলল, 'আচ্ছা যাচ্ছি—হাতের কাজ সেরে। আমাকে অত করে ভদ্রতার পাঠ তোমাকে শেখাতে হবে না। বরং তুমি একটু ভদ্র হওতো, সাবান মাখা মুখটা ভালো ক'রে ধুয়ে যাও। ওঁরা যখন এসেছেন, তখন বাড়িতেও ঢুকবেন, ব্যস্ত হয়ো না।'

অনুপম গালে হাত বুলিয়ে একটু হেসে বলল, 'ও, এতে আর কি হয়েছে।'

তারপর তিলু মিনুর মতই অনুপম দ্রুতপায়ে সিঁড়িগুলি ডিঙিয়ে গেল।

ইন্দু এসে এবার দোতলার বারান্দায় রেলিং ধরে একটু দাঁড়াল। গ্যাসপোস্টের নিচের খানিকটা জায়গা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। গাড়ি থেকে কালো ছিপছিপে চেহারার পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি যুবক আর একটি প্রৌঢ় মহিলাকে নামিয়ে নিচ্ছে। ইন্দু চিনতে পারল, চিন্ময় আর তার মা।

পরণের শাড়িটা ময়লা হয়ে গেছে। এ শাড়িতে বাইরের কারো সামনে বেরোন যায় না, ইন্দু ঘরে গিয়ে চওড়া কালো পেড়ে ফর্সা আর একখানা শাড়ি পরে নিল। কুটুম্বেরা আসায় অনুপম উল্লসিত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু ইন্দুর মোটেই ভালো লাগছে না। তার মন ফের খুঁৎখুঁৎ করতে শুরু করেছে। অবশ্য বিষয়টা সামান্যই। ঘরভাড়া সম্বন্ধে এমন কতজনকে কথা দিতে হয়, কতজনকে ফেরাতে হয়, এটা এমন নতুন কিছু নয়। কিন্তু চক্রবর্তী-গৃহিণী কাল এসে ইন্দুকে একেবারে পাকড়াও করে ধরেছিলেন, 'সে কি বউমা আমাকে কথা দিয়ে ঘর নাকি তুমি আর কাউকে দিয়ে দিচ্ছ?'

ইন্দুলেখা মৃদুস্বরে জবাব দিয়েছিল, 'দিয়ে দিচ্ছি ঠিক নয় মাসিমা, তারাই জোর ক'রে নিচ্ছে। আত্মীয়-কুটুম্ব মানুষ, কিছু বলাও যায় না।' কাত্যায়নী রুষ্ট-স্বরে বলেছিলেন, 'কিন্তু সেদিন আমি তোমার হাত ধরে অত ক'রে বলে গেলুম, তুমিও কথা দিলে, তবু তারা জোর করে কি করে? মিছে কথা বলে লাভ কি বাছা? নিজের জিনিস নিজে না দিলে কেউ কি নিতে পারে, তা মহা আত্মীয় হোক না। কিন্তু কথা যখন তুমি দিয়েছ ঘরও আমাকে দিতেই হবে, সবই তো বলেছি তোমাকে। ভাড়া না হয় আরো পাঁচ টাকা তুমি বেশি নিয়ো—'

ইন্দু ম্লান মুখে বলেছিল, 'না মাসিমা মাফ করবেন। তা হবার জো নেই। পারলে আমি আপনাকেই দিতুম।'

কাত্যায়নী বিরস মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'বেশ, কিন্তু তোমার কাছ থেকে এমন ব্যবহার আশা করিনি বউমা।'

ইন্দু সদর অবধি পিছনে পিছনে গিয়েছিল কাত্যায়নীর, 'কিছু মনে করবেন না মাসিমা, আমি ভারি লজ্জা পেয়েছি। জানেন তো এসব ব্যাপারে ওঁরই সব হাত। আমি একরকম কেউ নই।'

'কেউ নও।' কাত্যায়নী ইন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেসেছিলেন, 'কথার দাম যাদের কাছে নেই, তাদের মুখে কিছুই আটকায় না বউমা।'

ইন্দু এবার রেগে উঠে কঠিন জবাব দিতে যাচ্ছিল কিন্তু নিজেকে শেষ পর্যন্ত সংযত ক'রে নিয়ে শান্তভাবে বলেছিল, 'আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না মাসিমা।'

কাত্যায়নী যেতে যেতে বলেছিলেন, 'থাক থাক বাছা, আর কথা কাটাকাটি ক'রে লাভ কি। আমার বুঝতে কিছুই বাকি নেই।'

একটু চুপ করে থেকে বেগুন কোটা শেষ করে ইন্দু আবার তাকাল স্বামীর দিকে, 'কিন্তু না দেখে শুনেই চিন্ময় যে ঘরভাড়া নিয়ে টাকা আগাম দিল তোমাকে, শেষে এই নিয়ে একটা কেলেঙ্কারী-টারি হবে না তো? একতলার ঘর, তেমন আলো হাওয়া খেলে না, সব তাকে বুঝিয়ে বলেছো তো? এ সব ঘর তো প্রফেসরদের থাকবার মত নয়।'

অনুপম বলল, 'তুমিও যেমন, ওই নামেই প্রফেসর। এতদিন তো বেকারই ছিল, মাস কয়েক হোল কোন একটা নতুন কলেজে কমার্স সেকশনের লেকচারার হয়েছে। মাইনে কত? বড় জোর একশ সোয়া শ? অতও বোধ হয় হয়নি এখনো। ঘর পছন্দ হবে না!

অনেক বাড়ির দোতালাতেও এমন ঘর নেই। তা ছাড়া ভিক্ষার চাল আবার কাঁড়া আর আকাঁড়া, পেয়েছে এই যথেষ্ট।'

ইন্দু বলল, 'তবু তোমার একবার বলা উচিত ছিল। ঘর টর আগে দেখ, যদি পছন্দ হয় তাহলে ভাড়াব কথা পরে হবে। নিজেদের দোষ আগে থাকতে কাটিয়ে রাখা ভালো ছিল।'

অনুপম বলল, 'আহা তা কি আমি বলিনি ভেবেছ? কিন্তু চিন্ময় বলল, 'ওসব ঝামেলায় আর দরকার নেই অনুপমদা, পছন্দ যখন করতেই হবে তখন না দেখে করাই নিরাপদ। এ হোল কি, অভিভাবকেরা আগে মেয়ে দেখে পছন্দ করে কথা পাকাপাকি করে, তারপর ভদ্রতার জন্য ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন, 'দেখে এসো'। আমি বলি কি তার চেয়ে চোখ বুঁজে থেকে একেবারে শুভদৃষ্টির সময় চোখ খোলাই ভালো', যাই বলো, ছেলেটি বলে কিন্তু বেশ।'

ইন্দু বলল, 'খুব বুঝি মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছে।'

অনুপম বলল, 'হুঁ, মায়েমা তো ছেলে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাগল। আচ্ছা আমাদেব টুলির সঙ্গে—। এসে তো উঠুক তারপর সে সব দেখা যাবে।'

টুলি অনুপমের মামাশ্বশুরের মেয়ে। কলেজী নাম সুজাতা বোস।

ইন্দু বলল, 'না বাপু, আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রে ও সব ঘটকালির মধ্যে আগে থেকে যাওয়ার কি দরকার। ভালোর বেলায় ভগবান, মন্দের বেলায় মানুষ। ঘটকালি তো দূরের কথা, আমার ইচ্ছে নয় আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকি, বিশেষ করে ভাড়াটে বাড়িতে।'

অনুপম বলল, 'কেন থাকলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয় শুনি?'

ইন্দু বলল, 'হয়ই তো, কুটুম্ব-স্বজন যত দূরে দূরে থাকে ততই ভালো। কাছাকাছি থাকলেই দুদিন পরে সেই জল তোলা কাপড় মেলা নিয়ে ঝগড়া, আরো পাঁচ রকমের খুঁটিনাটি নিয়ে কথান্তর

মনান্তর। ফলে কুটুম্বিতার সেই মাধুর্যটুকু আর থাকে না। দূরে থাকলে সেটুকু রক্ষা হয়।'

অনুপম চটে গিয়ে বলল, 'এসব তোমার শহুরে সাহেবিপনা। বিলেতি বইয়ের বাংলা ট্রানস্লেশন থেকে শেখা। আমরা পাড়াগাঁয়ে একান্নবর্তী সংসারে মানুষ। আত্মীয়তা কুটুম্বিতার ধারণা আমাদের আলাদা। ছেলেবেলায় আপন জ্যেঠা খুড়ো থেকে শুরু করে কত দূর সম্পর্কের মাসতুতো পিসতুতো ভাই বোন নিয়ে রয়েছি আমরা, রান্না ঘরে ধরেনি দালানের বারান্দায় সারে সারে পাত পেতে বসে খেয়েছি। কখনো ডাল ভাত জুটেছে, কখনো পোলাও কালিয়া। তাতে আমাদের প্রাইভেসী প্রেষ্টিজও যায় নি, কুটুম্বিতার মাধুর্যও নষ্ট হয় নি।'

অনুপম একটু থামল। ইন্দুলেখা আগেকার দিনের মত প্রতিবাদ করল না, রান্নার আয়োজন নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রইল।

অনুপম বলতে লাগল, 'হ্যাঁ যত মাধুর্যের স্বাদ পেলাম এসে তোমাদের শহরে। পাশাপাশি ঘরে বাস করে এখানে একজনের খবর আর একজন রাখেনা, একজন মরলে আর একজনের খোঁজ নেওয়ার ফুরসৎ হয় না। আমরা পাড়াগাঁয়ের ছেলে, আত্মীয়তা কুটুম্বিতার ধারণা আমাদের অন্য রকম। উৎসবে ব্যসনে—কি যেন শ্লোকটা ছেলেবেলায় মুখস্ত করেছিলাম—সবটা মনে নেই; ভুলে গেছি, তোমার তো খুব মুখস্ত থাকে, বল দেখি পুরো শ্লোকটা—।'

ইন্দু বলল, 'থাক আর শ্লোকে কাজ নেই। দেখ গিয়ে আজ বুঝি কয়লা এসেছে দোকানে। আনাও গিয়ে, না হলে কাল স্কুল অফিসের ভাত নামবে না।' ইন্দু একটু হাসল, 'ছেলেবেলায় অমন কত শ্লোক মানুষ মুখস্ত করে কত শ্লোক ভোলে। যাও, এবার ওঠো, আর দেরী করোনা।'

স্বামীর পল্লীপ্রীতি, একান্নবর্তী পরিবারের ঔদার্যের কথা উঠলে

ইন্দুলেখা আজকাল আর বড় একটা তর্ক করে না। ইন্দু জানে অনুপমদের সেই একান্নবর্তী পরিবারের আজ আর চিহ্নটুকুও নেই। গ্রামের বাস অনুপমেরা বহুদিন প্রায় তুলে দিয়েছে। এক জ্ঞাতি খুড়ো বাড়িঘর আর অবশিষ্ট সামান্য জমি-জোত দেখাশোনা করেন। বছরে একবার অনুপম দেশে খোঁজখবর নিতে যায়। গাঁয়ের সঙ্গে সম্পর্ক এখন শুধু তার এইটুকু। আজ পঁচিশ বছর ধরে পড়াশুনো, চাকরি-বাকরি সব অনুপমের কলকাতায়, তবু আজ পর্যন্ত মনে-প্রাণে সে কলকাতার মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। এখনো গাঁয়ের প্রসঙ্গে সে মুখর হয়ে ওঠে, তাদের বিগত দিনের তালুকদারির বড়াই করে, তখনকার দিনের মানুষ, আচার, রীতিনীতির প্রশংসা এখনো অনুপমের মুখে ধরে না। এখনো গাছের কুল, খেজুরের রস, মাঠের মটর-কলাইয়ের জন্য অনুপমের মুখ চুলবুল করতে থাকে। বাল্যের কৈশোরের সেই বাঁশের ঝাড় আর গাবের বন ঘেরা সাগরপুর গ্রামখানিকে সে যেন স্মৃতির সঙ্গে, স্বভাবের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে।

এ-সব মুহূর্তে স্বামীকে দশ বার বছরের গ্রাম্য বালক বলেই মনে হয় ইন্দুলেখার। তাই সে যখন শহরের নিন্দা করে, এক-কথায় সমস্ত কলকাতা শহর আর বিংশ শতাব্দীর প্রায় গোটা পঞ্চাশেক বছরকে ধূলিসাৎ ক'রে দেয়, ইন্দু তখন মুখ টিপে হাসে, হয়তো কোন কোন সময় বলে, 'আচ্ছা আচ্ছা, আমার শ্বশুরবাড়ি সাগরপুরের মত আর জায়গা নেই পৃথিবীতে। এবার হোল তো?'

দু' পুরুষ ধরে ইন্দুরা কলকাতায় বাস করছে, অনুপমের কলকাতা বিদ্বেষের সেটাও যে অন্যতম কারণ, ইন্দু তা মনে মনে জানে।

কিন্তু কয়লা নেই শুনে অনুপম ততক্ষণে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, ধমকের সুরে বলতে শুরু করেছে, 'কয়লা নেই, একদিন আগে বলতে পার না?

কি যে স্বভাব তোমাদের। কোন জিনিস একেবারে না ফুরোলে কিছুতেই হুঁস হতে চায় না।'

মিনিট কয়েক বাদে কয়লার দোকানের উদ্দেশে অনুপম বেরিয়ে গেল।

•

সন্ধ্যা হয়েছে। এবার পার্ক থেকে ছেলেমেয়েরা ফিরে আসবে। রান্না শেষ করতে হবে তাড়াতাড়ি। তিলু বেশ রাত জাগতে পারে। কিন্তু মুস্কিল মিনুকে নিয়ে। খেতে বসবার সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ বুজে আসে। চোখ বোজা মেয়ের চেহারা মনে পড়ায় কড়ায় খুন্তি চালাতে-চালাতে ইন্দু একটু হাসল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল ছাদে শুয়ে চক্রবর্তী-বাড়ির মাসিমার নাতি দুটির অসুখ হয়েছে। তাঁকে কথা দিয়ে কথা রাখতে পারল না ইন্দু। মুখ দেখাবার আর জো রইল না তাঁর কাছে।

'কিন্তু তোমাদের দোষ কি। আজকাল দিনকালই এই রকম। শুধু গুরুজন আর বামুন পণ্ডিতের সঙ্গে ছল-চাতুরী কোরো না বউমা, তাতে ভালো হয় না।'

ইন্দুর বুকটা একটু কেঁপে উঠেছিল। ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার। অযথা এমন একটা খারাপ গাল দিলেন মাসিমা। কিন্তু এ নিয়ে ফের কোন কথা বলতে আত্ম-সম্মানে বেঁধেছিল ইন্দুর।

চিন্ময়দের দেখে কাল সকালের সেই ঘটনাটুকু ইন্দুলেখার ফের মনে পড়ল।

নিচ থেকে অনুপমের বিরক্তিভরা গলা শোনা গেল, 'কই এলে না তুমি? মায়েমা আর চিন্ময় খুঁজছে তোমাকে।'

আয়নার সামনে একবার দাঁড়াল ইন্দুলেখা। রান্নার ভাপ লেগেছে মুখে, একটু ঘেমেও উঠেছে, আঁচল দিয়ে মুছে নিল মুখখানা, তারপর ধীর-পায়ে নিচে নেমে এল।

ততক্ষণে অনুপম চিন্ময়ের মা হৈমবতীকে সদর থেকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে এসেছে। প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা। বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে, পরণে শাদা থান। মাথায় আধা-পাকা চুল ছোট ক'রে ছাঁটা। যৌবনে বেশ সুন্দরী ছিলেন, এখনো তার ছাপ কিছু কিছু আছে। রোগাটে চেহারা। শরীর ভালো যাচ্ছে না হৈমবতীর।

'চিনতে পাচ্ছেন মাঐমা?' নিচু হয়ে হৈমবতীর পায়ের ধুলো নিল ইন্দুলেখা।

হৈমবতী মৃদু স্বরে বললেন, 'থাক্ মা থাক্। অমনিতেই আশীর্বাদ করছি সতী-সাধ্বী হও, চিরায়ুষ্মতী হও।'

ইন্দু মনে মনে একটু হাসল। এ ধরণের পুরোন আশীর্বচন অনেকদিন কানে যায়নি। আজকাল এসব প্রায় উঠেই গেছে।

বলতে বলতে হৈমবতী একবার পিছনে সদরের দিকে তাকালেন, 'দেখিস চিনু, কিছু যেন খোয়া না যায়। বাসনের দুটো বাক্স—'

অনুপম হেসে বলল, 'ব্যস্ত হবেন না মাঐমা সবই আসবে। এখান থেকে কিছুই হারাবে না।'

ইন্দুও তাকাল সদরের দিকে। চিন্ময়ের পিছনের দিকটা দেখা যাচ্ছে। গায়ে আধময়লা একটি পাঞ্জাবি। কালো ছিপছিপে শরীর। মালপত্র নিয়ে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে চিন্ময়। গাড়োয়ান আর ঠেলাওয়ালাকে সে ভাঙ্গা হিন্দীতে কি সব নির্দেশ দিচ্ছে, কিন্তু আসলে নিজে চলছে তাদের নির্দেশেই। হৈমবতী বললেন, 'না অনুপম, ছেলে আমার কি গুণধর তুমি তো জানো না। জিনিস-পত্রের ওপর কোন মমতা নেই। কিছু আনতে কি চায়, আমি জোর ক'রে সব এনেছি। ওর অসাধ্য কিছু নেই। ও ইচ্ছা করলে সব খোয়াতে পারে।'

ঠেলাওয়ালার সঙ্গে বড় একটা ট্রাঙ্ক ধরাধরি ক'রে দরজার

চৌকাঠের কাছে নামাল চিন্ময়। সারা মুখটা বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরে উঠেছে। দেখতে সত্যিই ভারি কালো চিন্ময়। কিন্তু নাকচোখ যেন কালো পাথর থেকে কুঁদে বের করা। মুখখানা পাথরের মতই গম্ভীর, মনে হয় একটু যেন নিষ্ঠুরও। ইন্দু চোখ ফিরিয়ে নিয়ে হৈমবতীকে বলল, 'চিনু তো বেশ বড় হয়েছে।'

হৈমবতী একটু হাসলেন, 'ও তুমি বুঝি তোমার ছেলের সেই অন্নপ্রাশনের সময় দেখেছিলে তারপরে আর দেখনি?'

ইন্দু বলল, 'না, তারপরও দু'তিনবার দেখেছি। ভবানীপুরের বাসায় গিয়েছিল। কিন্তু তিন-চার বছরের মধ্যে আর খোঁজ খবর নেই।'

হৈমবতী বললেন, 'ওর স্বভাবের কথা আর বোল না। আত্মীয়-কুটুম্ব তো একেবারে কম নেই কলকাতায়, কিন্তু ও না চেনে শোনে কাউকে, না রাখে কারো কোন খোঁজ।'

আত্মীয়স্বজনের খোঁজ খবর নিল ইন্দু, 'ঠাকুরঝি, বিমলবাবু ওঁদের ছেলে-মেয়েরা সব ভালো আছে? ওঁরা বুঝি পাকিস্তান থেকে আর নড়বেন না?'

'হ্যাঁ, ভালোই আছে তারা।' হৈমবতী বললেন, 'না নড়াই ভালো, নড়ে কি সুখ তা এ ক'দিনেই বেশ টের পেয়েছি। জানিনা আরো কত ভোগ আছে কপালে।'

ইন্দু হৈমবতীকে তাঁদের ঘর দেখাতে লাগল। অনুপম গেল চিন্ময়কে সাহায্য করতে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মোটামুটি সাধারণভাবে দু'খানা ঘরে সব জিনিসপত্র একরকম ক'রে জড়ো ক'রে রাখা হোল।

অনুপম বলল, 'এখন এই পর্যন্ত থাক। আজতো সারাদিনই ছুটি।

ধীরে-সুস্থে পরে সব গুছিয়ে নেওয়া যাবে। উপরে চল চিন্ময়, একটু চা-টা খেয়ে নাও। চলুন মাঐমা।'

দোতালায় নিজেদের শোওয়ার ঘরে কুটুম্বদের নিয়ে গেল অনুপম। খাট, আলমারি, আয়না, ড্রেসিং-টেবিলে ঘর প্রায় ভরা। ঘর অনুপাতে জিনিসপত্রের বাহুল্যটা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সেই সঙ্গে চিন্ময়ের চোখে পড়ল সব জিনিসই প্রায় যথাস্থানে পরিপাটি করে সাজান-গুছানো, বেশ একখানি নিপুণ হাতের ছাপ যেন সর্বত্র প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে। কেবল চারিদিকের দেয়ালে ফটোর বহর দেখে একটু বিস্ময় লাগল চিন্ময়ের। দেয়ালের কোথাও কোন ফাঁক নেই। গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু ক'রে নেতাজী, ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীর সঙ্গে দু'তিনটি বিখ্যাত সিনেমা অভিনেত্রীর ছবি দেয়ালে পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। সেই সঙ্গে মেয়েলী হাতের চারু-শিল্প, মাছের আঁশের তৈরী 'স্বাগতম' 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ'। তার পাশে অনুপম আর ইন্দুলেখার প্রথম যৌবনের যুগল প্রতিকৃতি।

প্লেটে ক'রে খাবার আর ধবধবে শাদা দামী কাপে তামাটে রঙের চা ভর্তি ক'রে ইন্দুলেখা সামনে এসে দাঁড়াল, তারপর স্মিতমুখে বলল, 'নাও।'

অনুপমের দিকে তাকিয়ে চিন্ময় একটু হেসে বলল, 'আপনি দেখছি খুব ছবির ভক্ত।'

আত্মপ্রসাদে অনুপমও হাসল। 'ফটোগুলি আমি নিজে বেছে এনেছি, আর ঠিক যে জায়গায় যেটি মানায় আমি নিজের হাতে তেমনি করে সাজিয়েছি। ভালো হয়নি চিন্ময়?'

চিন্ময় চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তেমনি হেসে বলল 'ভালোই তো।'

কিন্তু হাসি পরিমিত হলেও তার ভিতরকার প্রচ্ছন্ন কৌতুকটুকু ইন্দুর চোখ এড়াল না—তার মুখও সামান্য আরক্ত হয়ে উঠল।

অনুপমের এই শিল্পানুরাগ তার একান্তই নিজের, ইন্দুর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কিছুমাত্র প্রভাব এর মধ্যে নেই। দু'চারখানা ফটো বাদ দিয়ে, সাজাবার ধরণটা একটু অন্যরকম করতে চেষ্টা করেছিল ইন্দু কিন্তু অনুপম তাতে কিছুতেই রাজী হয়নি। অথচ চিন্ময় হয়তো ভাবল অনুপমের এই গৃহ-সজ্জায় ইন্দুরও সমর্থন আর সহযোগিতা রয়েছে।

ভাবে ভাবুক। চিন্তাটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে ইন্দু স্নিগ্ধ একটু পরিহাসের স্বরে বলল, 'খাবারটা নাও, হাত থেকে নিতে লজ্জা করছে না কি?'

চিন্ময় চোখ নামিয়ে লজ্জিত স্বরে প্রতিবার করল 'বাঃ, লজ্জা করবে কেন।'

ইন্দুর স্মিত সুন্দর মুখের দিকে ফের একটু তাকিয়ে নিয়ে খাবার ভরতি চীনামাটির সুন্দর শাদা ডিসটি হাতে তুলে নিল চিন্ময়। কেবল জল-খাবার নয়, মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণটাও সেদিন অনুপমের ঘরেই মা আর ছেলেকে গ্রহণ করতে হোল।

খাওয়া-দাওয়ার পরে আধ ঘণ্টাখানেক মাত্র বিশ্রাম করে নতুন ভাড়াটেদের গৃহস্থ করবার জন্য অনুপম ফের ব্যস্ত হয়ে পড়ল। গৃহস্থালী যেন চিন্ময়ের নয়, অনুপমের নিজেরই। এ যেন অনুপমের আর এক মূর্তি। পরনে নীল-রঙের লুঙ্গি, সারা গা খোলা। হাতে হাতুড়ি। তার সেই বিলাতি বাবুগিরির চিহ্ন মাত্র নেই। কিন্তু এ বেশেও অনুপমকে বেশ মানিয়েছে। কোন্ ঘরের জানালার একটা পাল্লা আগের ভাড়াটের দুরন্ত ছেলেরা ভেঙে দিয়ে গেছে, সুইচ-বোর্ডের কোন্ সুইচটায় গোলমাল আছে, অনুপম নিজেই লেগে গেল মেরামতের কাজে। কিছুতেই সে পিছপাও নয়, মোটামুটি রকমে হাতেখড়ি আছে সব বিদ্যায়।

কিন্তু এসব ব্যাপারে চিন্ময় একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ। কিছুতেই সে হাত ছোঁয়াতে জানে না। তার ঘর দু'খানা নিয়ে অনুপমের ব্যস্ততা দেখে সে যেমন বিব্রত হোল তেমনি অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। দু'একবার অনুপমকে সে বললও, 'অনুপমদা, এবার আপনি বরং একটু বিশ্রাম করুন। সব আমি ধীরে ধীরে ঠিক করে নেব।'

অনুপম বলল, 'ঠিক করবার দায়িত্ব যে আমার চিন্ময়, অবশ্য এ সব আমার আগেই করে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু সময় পাইনি। হাফ্ ইয়ারলি ক্লোজিং শুরু হয়েছে। পরশু ছুটির দিন ছিল। তবু বেরোতে হোল। নিজে না গেলে সাব-অর্ডিনেটরা কাজ করতে চায় না।' এই আজ একটু সময় পেয়েছি। সব ঠিক করে দিচ্ছি, তুমি ভেবোনা।'

চিন্ময় বলল, 'একজন মিস্ত্রী-টিস্ত্রী—'

অনুপম বাধা দিয়ে বলল, 'কেন, কোন মিস্ত্রীর চাইতে আমার কাজ খারাপ হবে ভেবেছ? মোটেই না। আর এই সামান্য কাজের জন্য একটা মিস্ত্রীই বা ডাকতে যাব কেন? মিছামিছি পয়সা নষ্ট। তাছাড়া নিজের ঘরের কাজ নিজের হাতে ক'রে যে স্থখ তাতো তোমরা শহুরে বাবুরা বুঝতে পারবে না। কিন্তু একবার যখন আমার আওতায় এসে পড়েছ ভায়া, বাবুগিরি বেশিদিন রাখতে পারবে না। এবার ধরো দেখি এই তারটা—'

ইলেকট্রিকের তারের একটি প্রান্ত চিন্ময়ের হাতে তুলে দিল অনুপম।

বিব্রত চিন্ময় মিনিট-কয়েক অনুপমের একটু সাকরেদী করল, তার পর খানিক বাদে কি একটা ছলে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে, সারা দিন পারতপক্ষে অনুপমের কাছে আর ঘেঁষল না।

বিকালের দিকে অনুপম বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মাঐমা, চিন্ময়কে অনেকক্ষণ দেখছিনে, গেল কোথায় ও?'

হৈমবতী হেসে বললেন, 'আর বলো না, অনুপম, তোমার ভয়েই ও পালিয়েছে।'

'আমার ভয়ে?

হৈমতবী বললেন, 'তাইতো মনে হচ্ছে। কাছে থাকলেই তুমি এ-কাজে ও-কাজে বলবে, তাই সরে পড়েছে।'

অনুপম বলল, 'কাজকে বুঝি চিনু খুব ভয় করে?'

হৈমবতী বললেন, 'এমন ভয় ও কোন কিছুকে করে না, সংসারের কোন জিনিস হাত দিয়ে ছোঁবে না। চোখের সামনে নিজের জিনিস নষ্ট হয়ে গেলেও ফিরে তাকাবে না একবার। দুঃখের কথা আর কাউকে বলিনে বাবা। নিজের ছেলে হলে হবে কি, এমন কুঁড়ের-বাদশা আমি বাপের জন্মেও দেখিনি।'

অনুপম উদ্বিগ্ন অভিভাবকের স্বরে বলল, 'কথাটাতো ভালো নয়, মাঐমা। গৃহস্থের ছেলের সব কাজ-কর্মই শিখতে হয়, করতে হয়, নাহলে কি সংসার চলে? যাক আপনি ভাববেন না। আমার হাতে পড়লে দু'দিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কত অকর্মাকে কাজ শেখালুম—।'

হৈমবতী একটু হেসে বললেন, 'আমি তো পারলুম না। তোমরা পাঁচজনে এবার দেখ চেষ্টা করে।'

কাছে বসে রেশনের চাল থেকে কাঁকর বেছে ফেলতে ফেলতে ইন্দুলেখা অনুপম-হৈমবতীর আলাপ শুনছিল, ছেলের বিরুদ্ধে হৈমবতীর নালিশের মধ্যে গোপন প্রশ্রয়ের স্বর শুনে সে মৃদু হাসল।

হৈমবতী সেটুকু লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'হাসছ যে ইন্দু?'

ইন্দু বলল, 'এমনিই। স্বভাব কি কারো আর পাঁচজনের চেষ্টায় বদলায়?'

হৈমবতী বললেন, 'অবশ্য নিজেরও চেষ্টা করা দরকার। কেবল যে নিজে কাজ করবে না তাই নয়, আর কাউকেও করতে দেবে না। এমন এলোমেলো, অগোছাল নোংরা স্বভাব যে কি আর বলব। অথচ আমি যে একটু গুছিয়ে-টুছিয়ে রাখব তাও হবার নয়। আসলে এই রকম ভূত হয়ে না থাকলে ওর পেটের ভাত হজম হয় না, ঘুম হয় না রাত্রে। তুমি হাসছ, কিন্তু ওর ধরণ-ধারণ দেখলে আমার সত্যিই গায়ে রাগ ধরে বাছা। হোটেলে-মেসে যেভাবে থাকত থাকত, কিন্তু ঘর-সংসারে কি ও-সব চলে। তোমরা দেখ দেখি বলে-টলে চালচলনটা ফেরাতে পার কি না।'

ইন্দু মৃদু হেসে বলল, 'যার বলায় কাজ হবে তাকে আনছেন না কেন, ঘরে এবার বউ আনলেই পারেন।'

হৈমবতী বললেন, 'আনতে কি আমার অসাধ মা। কিন্তু আমি আনতে চাইলে হবে কি, ছেলে মাথা পাতে না। এলামতো সেই জন্যই। ভেবে দেখলাম একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে না পড়লে দূর থেকে কিছু হবে না। মতিগতিও বদলাবে না, বাউণ্ডুলে ভাবও ঘুচবে না। এবার কাছে থেকে দেখি চেষ্টা ক'রে। তোমরাও একটু সাহায্য টাহায্য কোরো।'

ইন্দু তেমনি মৃদু হেসে বলল, 'সাহায্য করব বইকি মাঐমা।'

নতুন ভাড়াটে এনে যে চতুবর্গ ফল লাভের আশা করেছিল অনুপম তা সফল হবার সমূহ কোন লক্ষণই দেখা গেল না। চিন্ময় যেমন অমিশুক তেমনি অসামাজিক। দিন-কয়েকের মধ্যে অনুপম যেচে বহুবার তার সঙ্গে আলাপ করতে গেছে, নিজের সুখ-

দুঃখের সুবিধা-অসুবিধার খবর বলেছে। জিনিসপত্রের দুর্মূল্যতা নিয়ে আলোচনা করেছে, স্বাধীনতা পেয়েও যে লোকজনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তেমন বাড়েনি তা নিয়ে অভিযোগ করেছে। কিন্তু চিন্ময়ের কাছ থেকে বিশেষ সাড়া পায়নি। আলাপ-আলোচনায় যে সে খুব উৎসাহী নয়, এমন কি অনিচ্ছুক সেটা, দু'তিন দিনের মধ্যেই বুঝতে বাকি থাকেনি অনুপমের এবং বুঝতে পেরে রীতিমত ক্ষুণ্ণও হয়েছে।

অবশ্য সকালে বিকালে যখনই অনুপম ঘরে ঢুকেছে চিন্ময়ের, সে হাতের কাজ রেখে উঠে দাঁড়িয়েছে, বসবার চেয়ার এগিয়ে দিয়ে সৌজন্যের সুরে বলেছে, 'আসুন অনুপমদা।' তারপর যতক্ষণ অনুপম নিজে থেকে না উঠে এসেছে, চিন্ময় একবারও বলেনি যে, হাতে তার কাজ আছে কিংবা কোন কারণে ব্যস্ত রয়েছে সে। যতক্ষণ অনুপম কথা বলেছে চিন্ময় শুনে গেছে, না হাঁ ক'রে জবাবও দিয়েছে কিন্তু নিজে থেকে কোন প্রসঙ্গই তোলেনি চিন্ময়। অবশেষে দশ-পনের মিনিট কথা বলে অনুপম নিজেই উঠে দাঁড়িয়েছে, 'যাই, বাজারের বেলা হোল,' কি 'টাইম হোল অফিসের।'

আলাপ করতে এসে নিজেই অতিষ্ঠ হয়ে ফিরে গেছে অনুপম, চিন্ময়ের ভিতরকার অনিচ্ছা, আর অসামাজিকতা টের পেতে তার দেরি হয়নি। অনুপম বিস্মিত হয়ে ভাবে—এমন লোক দেখান ভদ্রতা কেন এরা মিছামিছি করতে যায়। তার চেয়ে বলে দিলেও তো হয়, 'না-অনুপমদা, কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত আছি এখন, সন্ধ্যা-বেলায় আসবেন, কথাবার্তা বলা যাবে।'

এমন কথা চিন্ময় কোনদিনই বলে না। অবশ্য সন্ধ্যাবেলায় তার অবসর নেই। সে তখন কলেজে পড়াতে যায়। ছুটির দিনেও চিন্ময় হয় ও-সময়টায় বাসায় থাকে না, না হয় লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

তার ফুলের চারা দেখবার জন্য চিন্ময়কে একদিন ছুটির দিনে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল অনুপম, দু'তিন রকমের গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা ক্রিসেন্থেমাম অনুপম নতুন সংগ্রহ করেছে। দু'একটি ফুল সে নিজে থেকে চিন্ময়কে উপহারও দিয়েছিল, কিন্তু চিন্ময় তেমন উৎফুল্ল হয়ে ওঠেনি। অনুপম বুঝতে পেরেছে ফুল সম্বন্ধেও চিন্ময় আনাড়ি। গরমের দিন। ছুটির সন্ধ্যায় চিন্ময়কে খানিকক্ষণ ছাতে এসে গল্প করবার নিমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও সে আসেনি।

এরপর ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোটা দেখিয়ে দেওয়ার কথা পাড়তে অনুপমের ভরসা হয়নি। অবশ্য অনুপম জানে যে জোর ক'রে যদি বলে, চিন্ময় কিছুতেই না করতে পারবে না। তবু অনুরোধ করতে ইচ্ছা হয়নি। এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে তার একটু আলাপও হোল রাত্রে। খেয়ে-দেয়ে অনুপম শুয়ে পড়েছে ফ্যান খুলে দিয়ে। ছেলে-মেয়ে দুটি পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। ইন্দু রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে দিয়ে একখানা বই পড়ছিল।

অনুপম কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ ক'রে বলল, 'আঃ আবার বুঝি নতুন নবেল শুরু করলে।'

নভেল নয়, একখানা ভ্রমণ-কাহিনী। কিন্তু স্কুল-কলেজের পাঠ্য-বহির্ভূত সব বইই অনুপমের কাছে নবেল। ইন্দু বইখানার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা না করে সংক্ষেপে বলল, 'হুঁ।'

দু'চার মিনিট চুপ ক'রে থেকে অনুপম আবার বলল, 'সারাদিন খেটেছ, এবার একটু বিশ্রাম করো এসে। রোজ রোজ কি যে এত পড়। সারাজীবন ধরে বই পড়লে তবু সখ মিটল না। অথচ সব নবেলেই তো প্রায় একই কথা লেখা থাকে। নায়কের সঙ্গে নায়িকার হয় মিলন না হয় বিচ্ছেদ, নতুন কি আছে বল তো?'

এ অভিযোগ অনুপমের আজ এই প্রথম নয়। ইন্দু তর্ক করবার চেষ্টা না ক'রে মৃদু হেসে বলল, 'তা তো ঠিকই।'

অনুপম বলল, 'তা-ছাড়া কেবল এক রাজ্যের বই পড়লেই লোকে যে মানুষ হয় তা নয়, তার একটা দৃষ্টান্তও দেখলুম এবার।'

ইন্দু বুঝতে পারছিল অনুপম কার কথা বলছে তবু বলল, 'কি রকম।'

অনুপম বলল, 'এই ধরো নিচের চিন্ময়। দিন-রাত দোরে খিল দিয়ে বই নিয়েই আছে। কিন্তু—। না যেমন ভেবেছিলুম তেমন নয়।'

ইন্দু খোঁচা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'আমি তো তখনই বলেছিলুম, নিজের কুটুম্ব, নিজে দেখে শুনে এনেছ—। আমার কথা তো শুনলে না তখন।'

অনুপম নিজের নির্বাচনের যোগ্যতা সম্বন্ধে ফের সচেতন হয়ে উঠল, 'হাঁ, তোমার কথা শুনলেই হয়েছিল আর কি। একপাল লোক এসে একতলাটা একেবারে বাজার করে ছাড়ত। তার চেয়ে এই বেশ হয়েছে। সাড়া-শব্দটি পর্যন্ত নেই, কত শান্তি। অবশ্য ছেলেটি তেমন মিশুক নয়, তা ছাড়া আর তো কোন দোষ নেই, কি বল, হ্যাঁ বই-টই তো তুমি দু'চারখানা পড়তে পারছ এই বা কম লাভ কি।'

ইন্দু কোন কথা না বলে বইয়ের একটি পাতা উল্টাল। ভ্রমণ-কাহিনীটি মন্দ না, একটু নভেলী ঢঙে লেখা।

অনুপম বলল, 'ইচ্ছা করলে আরো একটা কাজও তুমি ওকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারো।'

'কি ?'

'কথায় কথায় তিলু মিনুকে পড়াবার কথাটা বল না।'

ইন্দু গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'না। ওদের যা পড়া তা নিজেরাই ইচ্ছা করলে বেশ দেখিয়ে দেওয়া যায়, তার জন্য পরের সাহায্য নিতে যাব কেন।'

অনুপম বলল, 'আহা, একেবারে পরও তো না।'

ইন্দু বলল, 'তোমার কুটুম্ব হতে পারে, কিন্তু—। তাছাড়া যতটা মনে হয় ছেলেপুলে ও পছন্দ করে না।'

অনুপমেরও অবশ্য তাই মনে হয়েছিল, কিন্তু নিজের কুটুম্বের নিন্দায় নিজেরই পরাজয়। চিন্ময়ের হয়ে একটু কৈফিয়তের সুরে অনুপম বলল, 'যারা মিশুক নয় তারা ছেলেবুড়ো কারো সঙ্গেই মিশতে পারে না। একেক জনের স্বভাব এই রকম থাকে। মাঐমা কিন্তু তিলু মিনুকে খুব ভালোবাসেন।'

ইন্দু অস্বীকার করল না, বরং একটু হেসেই বলল, 'তিলু আর মিনু তো তাঁর রীতিমত ভক্ত হয়ে গেছে। গল্প শোনে, সঙ্গে ক'রে গঙ্গা স্নানে নিয়ে যায়। বেশির ভাগ সময় তো তাঁর কাছেই আজকাল থাকে ওরা।'

হৈমবতীর সম্বন্ধে কোন অভিযোগ অনুপমেরও নেই। ছেলের অসামাজিক ব্যবহার তিনি সুদে-আসলে পুষিয়ে দিয়েছেন। অবসর পেলেই অনুপমদের খোঁজ-খবর নিতে আসেন। তিলু মিনুদের আদর করেন, তাদের দু'একটা আবদার মেটান। এর আগে নিরামিষ তরকারি অনুপমের মুখে রুচত না, কিন্তু হৈমবতী নিজের রাঁধা দু'একটি তরকারি বাটিতে ক'রে প্রায়ই পাঠিয়ে দিতে থাকায় অনুপমের প্রায় রুচি ফিরে আসবার জো হয়েছে। প্রথম প্রথম ভয়ে ভয়ে ভদ্রতা ক'রে একটু একটু মুখে দিত অনুপম। কিন্তু মুখে দিয়ে আজকাল বেশ ভালোই লাগে।

'নিরামিষ সত্যি ভারি চমৎকার রাঁধেন আপনি, মাছ ছাড়া যে কোন খাদ্য আছে এ-আমি আগে বিশ্বাসই করতাম না। কিন্তু এতো ভারি অন্যায়, আপনি রোজ রোজ এসব কেন পাঠান।'

হৈমবতী বলেন, 'তাতে কি হয়েছে কিইবা এমন দিতে পারি তোমাদের।'

বারণ করলেও শোনেন না হৈমবতী, অনুপমদের সঙ্কোচের জন্য অসন্তুষ্ট হন। ফলে ইন্দুলেখাও চিন্ময়ের খাওয়ার সময় একদিন একটু মাছের তরকারি নিয়ে এল। চিন্ময় তো খাবেই না। অনেক অনুরোধের পর খানিকটা তুলে নিয়ে ভাত মেখে নিল। বেশির ভাগ পড়ে রইল বাটিতে। ইন্দু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, অপেক্ষা করল ভালো কি মন্দ চিন্ময় কিছু বলে কি না, কিন্তু সে কোন মন্তব্যই করল না। অথচ রান্নার হাত ইন্দুরও বেশ পাকা। যে খায় সেই প্রশংসা করে। মনে মনে রাগই হোল ইন্দুর। ঠিক করল আর সে কোনদিন চিন্ময়কে কোন তরকারি-টরকারি পাঠাবে না।

এমনি ছোট ছোট দু'একটি ঘটনায় ইন্দুর মন চিন্ময়ের উপর বেশ একটু বিরূপ আর অপ্রসন্নই রয়েছিল। এ পর্যন্ত সামান্য দু'একটি কথাবার্তা ছাড়া তেমন আলাপও হয়নি তার সঙ্গে। বেশি কথা বলবার অভ্যাস ইন্দুর নেই, নিষ্প্রয়োজনে কারো সঙ্গে আলাপ করতে সে ভালোও বাসে না।

কিন্তু সেদিন গেল একটু আলাপ করতে। ঠিক একেবারে নিষ্প্রয়োজনে নয়, বইয়ের প্রয়োজনে। ইন্দুর ধারণা এই জিনিসটা ছলে-বলে শত্রু-মিত্র সকলের কাছ থেকেই সংগ্রহ করে পড়া চলে। চুরি না করলেই হোল। 'আংটি তুমি কার?' 'যার হাতে আছি।' বইও তেমনি। যে পড়ে তখনকার মত বইতো তারই। বই

পড়বার সময় মালিকের কথাও মনে থাকে না, লেখকের কথাও নয়। যে পড়ে আর যাদের কথা পড়ে বইতে তারাই তো সব।

দিন দুই হোল পড়বার মত বই নেই হাতে। দুপুরে ঘুমোবার অভ্যাস নেই ইন্দুর। সেলাই-টেলাইর কাজগুলি এই সময় সেরে রাখে সে। সবদিন ভালো লাগে না, মন বসে না, ইচ্ছা হয় বই নিয়ে বসতে। অনুপম অফিসে বেরিয়েছে সেই পৌণে দশটায়, একটু বাদে খেয়েদেয়ে তিনু গেছে স্কুলে। মিনু অনেকক্ষণ দুরন্তপনা করে সবে ঘুমিয়েছে। নিচের ঘরে দোর ভেজিয়ে দিয়ে ঘুমাচ্ছেন হৈমবতী। এ সময় চিন্ময় কোনদিন বেরিয়ে যায়, কোনদিন বা ঘরেই থাকে। আজ যে বেরোয়নি ইন্দু তা লক্ষ্য করেছে। ভাবল বই যদি কিছু থাকে একখানা চেয়ে নিয়ে চলে আসবে।

ভিতর থেকে দোর বন্ধ। রুদ্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইন্দু একটু ইতস্তত করল। একবার ভাবল ফিরে যায়। চিন্ময় হয়ত কোন কাজকর্ম করছে, ডাকলে নিশ্চয়ই ভ্রূ-কোঁচকাবে। কিন্তু পরমুহূর্তে ভাবল কোঁচকায় তো কোঁচকাক। কে ধার ধারে তার অত ভ্রূ-কোঁচকানির। একখানা বই নিয়েই ইন্দু ফিরে আসবে। শত হোলেও চিন্ময় তাদের একতালার ভাড়াটে।

আসলে চিন্ময়ের ঔদাসীন্যে ইন্দুর আত্মাভিমান, আর অহংবোধ পীড়িত হচ্ছিল ; একতালায় এ পর্যন্ত যত ভাড়াটে এসেছে প্রত্যেকেই ইন্দুর শিষ্টাচার মিষ্টালাপের প্রশংসা করেছে। স্বামীর যত আত্মীয়-কুটুম্ব-স্বজন, বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ইন্দুর, তাদের সকলেই কেউ তার রান্নার, কেউ গৃহণীপনার, কেউ সেলাইর কাজের, কেউ বা পাঠানুরাগের প্রশংসা করেছে। যারা তা করেনি তারাও তিনু-

মিনুকে ডেকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করেছে, নাম-ধাম জিজ্ঞেস করেছে, বলেছে 'চমৎকার ছেলে-মেয়ে আপনার।'

কেবল তাই নয়, ইন্দু তাদের কবিতা মুখস্থ করতে শিখিয়েছে, গান শিখিয়েছে, মিনু এরই মধ্যে বেশ একটু আধটু নাচতেও পারে। ইন্দুর ছেলে-মেয়েদের সেই মিষ্টি কবিতা, আর গান শুনে সকলে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছে। আর সেই খ্যাতি-প্রশংসা, সেই আদর-যত্ন সব তো ইন্দুরই প্রাপ্য। তারা তো ইন্দুরই নিজের হাতে গড়া ঐশ্বর্য। কেবল নিজের রক্ত-মাংসের নয়, তার নিজের শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি-প্রবৃত্তি আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে গড়া। তাদের স্বীকৃতিতে ইন্দুরই স্বীকৃতি।

কিন্তু কুটুম্বের ছেলে হয়েও চিন্ময় তিলু মিনুকে পর্যন্ত একবার ডেকে জিজ্ঞাসা করেনি, 'তোমাদের নাম কি, কোন-ক্লাসে পড় ?'

একদিন বুঝি ওরা চিন্ময়ের ঘরে ঢুকেছিল, চিন্ময় বলে দিয়েছে, 'বাইরে যাও, এ-ঘরে গোলমাল করো না।'

অথচ অযথা গোলমাল করবার মত ছেলে-মেয়ে ইন্দুর নয়।

তিলু এসে নালিশ করেছিল মার কাছে, 'একটু কেবল গিয়ে দাঁড়িয়েছি মা, কোন জিনিস আমরা ধরিওনি, বলে কিনা এ ঘর থেকে যাও। ভারি তো ঘরওয়ালা হয়েছেন। ঘর তো আমাদের। দয়া করে আমরা ভাড়া দিয়েছি তবে এসে রয়েছে।'

ইন্দু গম্ভীর মুখে বলেছিল, 'ছিঃ ওসব বলে কাজ নেই। তবে তোমরা ও ঘরে আর যেয়ো না।'

তিলু বলেছিল, 'আমি তো যাব না। মিনুকেও তুমি বারণ করে দাও মা।'

বারণ করবার আগেই মিনু দাদার কথার প্রতিধ্বনি করে বলেছিল, 'আমিও যাবনা মা।'

ইন্দু একটু হেসে বলেছিল, 'হ্যাঁ, যতক্ষণ সেধে ডেকে আদর করে না নেবে ততক্ষণ কেউ তোমরা যাবে না।'

তিলু বলেছিল, 'সাধলেও যাব না, বয়ে গেছে আমাদের যেতে।'

তখনকার মত ইন্দুও সেই প্রতিজ্ঞাই করেছিল। কিন্তু আজ দুপুরে তার মনে হোল একখানা বইয়ের খোঁজে মিনিট খানেকের জন্য গেলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হবে না।

খানিক ইতস্তত করেই ইন্দু একটু উঁচু গলায় বলল, 'চিন্ময় বুঝি আজ বেরোও নি?'

ঘরের ভিতর থেকে চিন্ময়ের গলা শোনা গেল, 'আসুন, দোর খোলাই আছে।'

দোরের একটি পাল্লা ফাঁক করে ইন্দু গিয়ে ঘরে ঢুকল, তারপর মৃদু হেসে বলল, 'কি করছিলে?'

একখানা ইংরেজী কাগজের জন্য প্রবন্ধ লিখতে বসেছিল চিন্ময়, ইন্দুলেখা এসে পড়ায় খাতাকলম সরিয়ে রেখে চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে বসল। একটু দূরের আর একটা চেয়ার ইন্দুকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ও কিছু না, বসুন।'

ইন্দু বসল না, দাঁড়িয়ে থেকেই বলল, 'একখানা বই নিতে এলাম।'

চিন্ময় বলল, 'বই!'

টেবিলে তক্তপোষে কেবল বইই ছড়ানো। তবু চিন্ময় বেশ একটু বিব্রত হয়ে বলল, 'কি বই চান বলুন?'

ইন্দু চেয়ারটায় না বসে, তার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে চিন্ময়ের ঘরের চারিদিকে একটু চোখ বুলিয়ে নিল। এ ঘর থেকে কিছু বের করতে হলে খুঁজে দেখবার মত অবস্থাই বটে। পুব দিকে একটি তক্তপোষ। তার ওপর বিছানা বইপত্র একসঙ্গে জড়ো করা রয়েছে। আধ-খোলা একটি স্যুটকেশও তার ওপর স্থান পেয়েছে। তার ভিতর থেকে উঁকি

দিচ্ছে ঠেসে রাখা জামাকাপড়। দক্ষিণ দিকে একটি ট্রাঙ্ক। জানালার ধারে ছোট্ট টেবিল। তার একদিকে কতকগুলি বইয়ের ওপর ক্ষৌরী হওয়ার সরঞ্জাম, আয়না চিরুণী আর একদিকে ভাজ করা শাদা কাগজ, ফাউণ্টেনপেন, কালির দোয়াত, এ্যাস ট্রে।

কেবল চারিদিকের দেয়ালগুলি সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন। দিন কয়েক আগে চুণকাম করানো হয়েছে। সেই শাদা রঙ এখনো ধবধব করছে। ক্যালেণ্ডারের পাতা মৃদু বাতাসে সামান্য উড়ছে। তা ছাড়া কোন দেয়ালে আর কিছু নেই। নিজেদের ঘরের ছবি-ঠাসা দেয়াল দেখে দেখে ইন্দুর অভ্যস্ত চোখ দুটি এ ঘরের দেয়ালগুলির এই শুভ্র শূন্যতায় যেন বেশ একটু তৃপ্তি বোধ করল। কিন্তু ঘরটা এমন নোংরা করে রেখেছে কেন চিন্ময়।

প্রশ্নটা অনিচ্ছায় অসাবধানে মুখেও এসে পড়ল ইন্দুর, 'ঘরের এ কি চেহারা করেছ?'

চিন্ময় চারদিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে মৃদু হাসল, 'ঠিকই বলেছেন, চেহারাটা ভালো দেখা যাচ্ছে না।'

ইন্দু বলল, 'আমার তো মনে হয় তোমরা ঘর-দোরের এই চেহারাই ভালো দেখ।'

'ভালো দেখি?'

ইন্দু একটু শ্লেষের ভঙ্গিতে হাসল, 'তা ছাড়া কি? ইংরাজীতে একেই বোধ হয় বলে কেয়ারফুল কেয়ারলেস্‌নেস্‌। ইচ্ছা করে ঘর অগোছাল আর নোংরা না করলে তোমাদের যে কাব্য হয় না।'

বলেই ইন্দু হঠাৎ থেমে গেল। চিন্ময়ের ঘরদোরের সমালোচনা করতে সে এখানে আসেনি। একখানা বই চেয়ে নিতে যতটুকু সময় লাগে, যেটুকু কথার দরকার হয় তার বেশি সময় দিতে কি কথা বলতে ইন্দুর মোটেই ইচ্ছা ছিল না। আলাপ মেলামেশা যে ভালো-

আসে না, যে নিজে থেকে যেচে কথা বলতে আসে না, তার স্বভাবের ভালোমন্দের আলোচনাই বা তার সঙ্গে করবার কি প্রয়োজন? কিন্তু স্বামী আর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে চিন্ময় তেমন ভদ্র ব্যবহার করেনি শুনে ভিতরে ভিতরে ইন্দুর মন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। চিন্ময়ের অপরিচ্ছন্ন অভ্যাসকে এই উপলক্ষ্যে একটু খোঁচা দিতে পেরে তার মনটা একটু প্রসন্নই হোল।

চিন্ময় একমুহূর্ত ইন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখল, তারপর বলল, 'না ইন্দুদি, আপনি যা ভেবেছেন তা নয়। বাইরের ভিতরের কোন রকম নোংরা অভ্যাসকে আমিও কাব্য বলিনে, তাকে কুশ্রীতাই বলি। কিন্তু গাল দিলেই কি স্বভাব বদলায়? জীবন থেকে সব অকাব্য দূর হয়?'

চিন্ময়ের গলার স্বরে বেদনার আভাস ছিল।

ইন্দু অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'তুমি বুঝি রাগ করলে! আমি কিন্তু সত্যিই গাল দিইনি। ঠাট্টা করেছিলাম। পুরুষ মানুষ এমন একটু অগোছালো-টোছালো ভাবে থাকলে বরং ভালোই দেখায় যাই বলো। আর আমাদের উনি। সব সময় একেবারে ধোপ-দুরস্ত ফিটফাট বাবু সেজে থাকতে চান। কেবল কি নিজে? ঘরদোরও সাজানো-গুছানো চাই। একটি সূঁচও এদিক ওদিক হবার জো নেই। বাড়ি তো নয় যেন অফিস-বাড়ি। সব সময় অত আঁটসাঁট ভাব ভালো লাগে না বাপু।'

চিন্ময় একটু হাসলো, 'আমাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে পতি নিন্দা করে বসলেন যে ইন্দুদি। নাকি, এ নিন্দা নয়, বন্দনাই। অন্নপূর্ণার ব্যাজস্তুতি।'

ইন্দু হেসে বলল, 'আহা, জায়গাটুকু কিন্তু ভারতচন্দ্র বড় চমৎকার লিখেছিলেন না?'

'কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।'

ভারি সুন্দর সুরেলা গলা ইন্দুর। বলবার ভঙ্গিতে তার কাব্য-প্রীতিরও পরিচয় মিলল।

চিন্ময় বলল, 'আপনি তো বেশ সুন্দর আবৃত্তি করেন।'

ইন্দু লজ্জিত হয়ে বলল, 'তুমিও যেমন। সুন্দর না ছাই। জীবনে ভালো করে লেখাপড়াই শিখতে পারলাম না।'

ইন্দুর স্মিত মুখে ম্লান ছায়া পড়ল।

চিন্ময় বলল, 'শিখলেন না কেন, এখনো তো শিখতে পারেন।'

ইন্দু বলল, 'তবেই হয়েছে। এই বয়সে কার কাছে পড়া শিখতে যাব? তোমার কাছে? যা ধৈর্য তোমার, আর যা মানুষ-জন পছন্দ কর তুমি! একবারের বেশি দু'বার এলেই বলবে আমার কাজ আছে, বেরোন ঘর থেকে। কি বল, তাই না?'

চিন্ময় বলল, 'সবাইকেই কি সেই কথা বলি?'

ইন্দু হেসে বলল, 'ও সবাইকে নয় মানুষ বেছে বেছে বল বুঝি? আচ্ছা জানা রইল' বলে ইন্দু দোরের দিকে এগিয়ে চলল।

চিন্ময় বলল, 'বই নিলেন না?'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ইন্দু বলল, 'দিলে কই যে নেব? কলে জল এসে গেছে। এখন আর দাঁড়াবার সময় নেই, বই আমার জন্য খুঁজে রেখ। পরে এসে নেব।'

চিন্ময় বলল, 'আচ্ছা।'

বই আদান-প্রদানের সূত্রে আলাপটা ক্রমে জমে উঠল। অবশ্য আলাপ করবার সময় ইন্দুর কম। সকালের রান্না খাওয়া শেষ করতে করতে দুপুর গড়িয়ে যায়। দুপুর বেলায় দুরন্ত মেয়েকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে নিজেও গড়িয়ে নেয় একটু। নইলে শরীরের ক্লান্তি যেন

যেতে চায় না। তারপরেও খুঁটিনাটি কাজের অভাব নেই। অনুপম আর ছেলে-মেয়েদের আটপৌরে শার্ট পাঞ্জাবি প্যাণ্ট ফ্রক ইন্দু নিজের মেসিনেই করে। তাছাড়া পাড়া-পড়শীর দু'একটা ফরমায়েসও মাঝে মাঝে সরবরাহ করতে হয়, সংখ্যায় কম হলেও নিজের সায়া শেমিজ ব্লাউজও লাগে কিছু কিছু। তার ফলে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই মেসিনটা চালু রাখতে হয়। এ সব কাজ করে সাধারণত দুপুর বেলায়। কেবল দিন দুপুর নয়, রাত দুপুরেরও। বিকাল বেলায় কলে জল আসার সঙ্গে সঙ্গে বৈকালিক পর্ব শুরু করতে হয়, ঠিকে ঝি বাসন্তী অবশ্য বাসন মাজে, জল তোলে কয়লা ভাঙ্গে। তবু ইন্দুর থাকতে হয় সঙ্গে সঙ্গে। ইন্দুর হাত কম তাড়াতাড়ি চলে না। কিন্তু দিনের পর দিন কাজও যেন পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলে।

তবু এরই ফাঁকে দুপুরের পরে প্রায় রোজই কিছুক্ষণের জন্য আলাপ-আলোচনার সময় হয়ে উঠতে লাগল। বহুদিন ধরে স্বামী আর ছেলে-মেয়ের খাওয়া পরা, শোওয়া-ঘুমানোয় স্বাচ্ছন্দ্যদান ছাড়া ইন্দুর আর কোন কাজ নেই, চিন্তা নেই। অনুপমের সঙ্গে যে সব আলাপ-আলোচনা হয় ঘুরে ঘুরে তাও ওই সব বিষয়ের এলাকায় এসে পড়ে। তিলু আর মিনু বেশি মিষ্টি খায়। অনুপম নিজেও বড় কম খায় না। তবু চিনি ফুরোবার দিন যে দাম্পত্যালাপ শুরু হয় তার মধ্যে শর্করার ভাগ খুব বেশি থাকে না।

কিন্তু হঠাৎ একতলার ঘরে চিন্ময়ের মধ্যে এমন একটি লোকের সাক্ষাৎ পেল ইন্দু, যার সঙ্গে চাল ডাল তেল কয়লার আলোচনা করবার জো নেই। ওসব স্থূল বস্তুতে চিন্ময়ের ভারি অনাসক্তি। কিন্তু তাই বলে ইন্দুর যে তেমন আক্ষেপ দেখা গেল তা নয়, বরং মুখ বদলাতে পেরে মনে মনে সে খুসিই হোল। আর সেই খুসির আভাসটা মুখেও একেবারে অপ্রকাশিত রইল না।

চিন্ময়ের দোষের অভাব নেই, ইন্দু সে কথা মনে মনে স্বীকার করল। চিন্ময় অসামাজিক, কারো সুখ-দুঃখ অসুখ-বিসুখের খবর রাখে না। তিন্নু যে দুদিন জ্বরে ভুগল একবারও তার খোঁজ নেয়নি চিন্ময়। তাছাড়া ভিতরে ভিতরে চিন্ময় অহঙ্কারী, এমন কি নিজের দোষ-ত্রুটি অক্ষমতাগুলিকেও যেন পঙ্গু সন্তানের মত চিন্ময় গোপনে লালন করে, প্রশ্রয় দেয়। দোষের সীমা নেই চিন্ময়ের। এসব কারণে ইন্দুর মন ওর ওপরে ভারি বিমুখ হয়ে পড়ে। কিন্তু চিন্ময়ের এই ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দুর সে কথা যেন মনে থাকে না। চিন্ময়ের কাছে যেন সত্যি সত্যি ওসব কিছু আশা করবার নেই।

অবশ্য চিন্ময়ের মতামত, ভাবনা ধারণার সঙ্গে ইন্দুর যে সব সময় মিল হয় তা নয়। বরং বেশির ভাগ সময়েই হয় না। কিন্তু তাতে কি। তর্ক করবার জন্যও তো একজন লোকের দরকার।

দু'তিনখানা বাংলা ছোটগল্পের বই জমেছিল ইন্দুর কাছে। চিন্ময়কে বইগুলি সেদিন ইন্দু দুপুর বেলায় ফেরৎ দিতে এল নিচের ঘরে।

ঘরখানা ঠিক আগের মত অগোছাল নেই। টেবিলে র‍্যাকে বইগুলি মোটামুটি গুছানো। বাক্স তোরঙ্গগুলি তক্তপোষের তলায় স্থান পেয়েছে। ওপরে ধবধব করছে ফর্সা চাদর ইন্দু অবশ্য তক্তপোষের দিকে গেল না চেয়ারটা টেনে তাতে বসে পড়ে বলল, 'বাঃ ঘর দোরের চেহারা এরই মধ্যে বেশ ফিরেছে দেখছি।'

চিন্ময় বলল, 'ও, কেবল ঘর দোরের চেহারার দিকেই লক্ষ্য বুঝি আপনার?'

ইন্দু বলল, 'তা ছাড়া কি। ঘর সংসারের চাইতে আর কি বড় জিনিস আছে আমাদের?' কথাটায় কেমন একটু যেন শ্লেষ আর বিষাদের সুর এসে লাগল। যেন বৃহত্তর কিছু থাকলেই ভালো হোত।

চিন্ময় প্রসঙ্গান্তরে যেতে চেষ্টা করে বলল, 'যাক্‌গে। গল্পের বইগুলি কেমন লাগল বলুন।'

ইন্দু বলল, 'লাগল এক রকম। ভালো উপন্যাস-টাস যদি কিছু থাকে এবার তাই একখানা দাও।'

চিন্ময় হেসে বলল, 'মানে অনেকগুলি গল্প নয়, তিন চারশ' পৃষ্ঠাব্যাপী একটা প্রকাণ্ড গল্প। ছোট গল্পের তুলনায় যে কোন প্রকাণ্ড গল্পই বোধ হয় আপনার বেশি ভালো লাগে।'

ইন্দু খোঁচাটা হজম করে স্বাভাবিকভাবে বলল, 'হ্যাঁ ছোট ছোট গল্পের চাইতে উপন্যাসই বেশ ভালো লাগে আমার। তা অস্বীকার করব কেন।'

চিন্ময় বলল, 'এ স্বীকৃতি অবশ্য পাঠিকাসুলভ, পাঠিকা মাত্রেই লম্বা গল্পের ভক্ত।'

ইন্দু বলল, 'কেবল পাঠিকা কেন সেদিন তো বলছিলে সাধারণ পাঠকেও গল্পের চাইতে উপন্যাস বেশি পছন্দ করে, বিক্রীও উপন্যাসই বেশি হয়।'

চিন্ময় বলল, 'ওই একই কথা। রুচি প্রবৃত্তির দিক থেকে প্রকৃতি আর প্রাকৃত জনে কোন ভেদ নেই। আচ্ছা বলুন তো, ছোট গল্প কেন খারাপ লাগে আপনাদের?'

ইন্দু হেসে বলল, 'তুমি গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে চাইছ। ছোট-গল্প মাত্রেই যে খারাপ লাগে তা তো বলিনে। কেবল বলতে চাই ছোট বড়োর চাইতে সব সময়েই ছোট।'

চিন্ময় বলল, 'কিন্তু আমি যদি বলি ব্যাপারটা আলাদা। আপনি যাকে ছোট বলছেন তা ছোট নয়, সূক্ষ্ম। তা বুঝতে হলে—'

ইন্দু হেসে বলল, 'সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার। তাও না হয় মানলুম। সূক্ষ্ম গল্পের প্যাঁচ বুঝতে হলে ছুঁচলো বুদ্ধি চাই। কিন্তু ছোটই বল

আর সূক্ষ্মই বল বড় গল্পে আমাদের ঘর সংসার আর তোমাদের সমাজ সংসারের যত কথা ধরে, ছোট গল্পে কি তা ধরে?'

চিন্ময় বলল, 'ছোট গল্প তো আর একটি নয়। হাজার পাখী হাজার হাজার ফুল। একেক ফুলের একেক রকম গন্ধ, একেক পাখীর একেক রকম ডাক। সব নিয়ে বন, সব নিয়ে জীবন। চিন্ময়ের দিকে তাকিয়ে ইন্দু মুহূর্তকাল চুপ করে রইল। কি ক'রে অত সুন্দর ক'রে আর অত আবেগ দিয়ে কথা বলতে পারে চিন্ময়? তার কথা শুনে মনে হয় যেন সত্যিই এক ঝাঁক নানা রঙের পাখী এই ছোট্ট ঘরের মধ্যে উড়ে এসেছে। কেমন যেন গা'টা শির শির ক'রে উঠল ইন্দুলেখার। খানিক বাদে একটু ভেবে নিয়ে ইন্দু বলল, 'তোমার মত অত গুছিয়ে বলি এমন সাধ্য নেই, কিন্তু তোমার কথাই না হয় ধরলুম তাতেই বা কি। গুণতিতে হোলই বা ফুল আর পাখী হাজার হাজার, লাখ লাখ, তবু প্রকৃতিতে পাখী তো পাখীই, ফুল তো আর ফুল ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু প্রকাণ্ড একটা বন কি কেবল ফুল আর পাখীতেই ভরে?'

চিন্ময় একটুকাল চুপ ক'রে চেয়ে রইল ইন্দুর দিকে তারপর বলল, 'ভরে কিনা জানিনে, কিন্তু এবার আপনিও ভারি সুন্দর কথা বলেছেন।'

প্রশংসাটা কেবল মুখের কথায় নয়, চোখের দৃষ্টিতেও যেন ফুটে উঠতে চাইল চিন্ময়ের।

ইন্দুর সারা মুখে মুহূর্তের জন্য লজ্জার আভা ছড়িয়ে পড়ল। চোখটা একটু নামিয়ে নিয়ে বলল, 'সুন্দর না ছাই' তারপর ইচ্ছা ক'রেই হঠাৎ স্বামীর প্রসঙ্গ এনে বলল, 'তোমাদের ডেফিনেশনে তোমার অনুপমদাও বোধ হয় প্রাকৃত জন। কিন্তু একটা দিক থেকে তোমার সঙ্গে তাঁর মিল আছে। তিনিও বড় উপন্যাস পছন্দ করেন না।'

কৌতুক আর কৌতূহল মেশানো স্বরে চিন্ময় বলল, 'তাই নাকি? কেন?'

ইন্দু মুখ টিপে হাসল, 'আমার শেষ করতে দেরী হয় বলে।'

চিন্ময় হাসল, 'ও তাই বলুন।'

ইন্দু বলল, 'কেবল তাই নয়, বড় উপন্যাসকে কি ক'রে ছোট গল্পের মত তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় সে সম্বন্ধেও তিনি মাঝে মাঝে আমাকে উপদেশ দেন।'

চিন্ময় বলল, 'তাই নাকি। উপদেশটা বলুন তো। হয়তো আমারও কাজে লাগবে।'

স্বামীর কথা মনে পড়ায় ইন্দু বেশ একটু সস্নেহ কৌতুক বোধ করল, স্নিগ্ধ কৌতুকের হাসি তার পাতলা রক্তাভ ঠোঁটেও ফুটে উঠল একটু।

ইন্দু বলল, 'উপদেশটা হচ্ছে এই—বই আগাগোড়া পড়বার দরকার কি। গোড়ার খানিকটা পড় আর শেষের খানিকটা। তা'হলেই তো ব্যাপারটা সব বোঝা যাবে।'

চিন্ময় কৃত্রিম গাম্ভীর্যে বলল, 'কৌশলটা বোধ হয় তিনি সাময়িক-পত্রের সমালোচকদের কাছ থেকে শিখেছেন।'

ইন্দু বলল, 'উঁহু, কোন সমালোচকের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব আছে বলে তো জানিনে। কৌশলটা তাঁর নিজেরই বের করা। নিজেই অনেকদিন গল্প করেছেন। কলেজে যখন পড়তেন তখন কোন এক প্রফেসার নাকি বাইরের বই পড়বার জন্য খুব চাপ দিয়েছিলেন। ক্লাসের মধ্যে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করতেন। অমুক বই পড়েছ? তমুক বই পড়েছ?'

চিন্ময় বলল, 'তারপর?'

ইন্দু মুখ মুচকে হাসল, 'তারপর আর কি। উনিও বই পড়া

শুরু করলেন। সপ্তাহে তিনখানা, চারখানা। লাইব্রেরীয়ান অবাক, ছেলেরা অবাক, প্রফেসার অবাক। একদিন সেই প্রফেসার মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার কি তুমি এমন বইয়ের ভক্ত হলে কবে থেকে?' তোমার অনুপমদা ভ্রূ-কুঁচকে জবাব দিলেন, 'কেন স্যার, স্পোর্টসএর ছেলেদের কি বই পড়তে নেই? তারা কি চাঁদা দেয় না লাইব্রেরী ফণ্ডে?' প্রফেসার আর কিছু বলতে সাহস পেলেন না।

চিন্ময় হাসতে লাগল। একটু বাদে বলল, 'অনুপমদা কিন্তু আপনার বিদ্যানুরাগের খুব প্রশংসা করেন।'

ইন্দু লজ্জিত হয়ে বলল, 'সেদিনের কথা বলছ বুঝি তুমি?'

সেদিন ছিল অনুপমের ছুটির দিন। আসবার সময়ে ইন্দু স্বামীকে নিজেই সঙ্গে ক'রে ডেকে এনেছিল, 'দেখবে চল, তোমার একতলার গৃহবাসী ভাড়াটেকে, মেজে ঘষে কি রকম দোতলার সামাজিক মানুষ ক'রে তুলেছি।'

অনুপম বলেছিল, 'তাই নাকি? তোমার কীর্তিটাতো দেখতেই হয় তাহলে।'

বিকালের দিকে চিন্ময়ের ঘরেই সেদিন চায়ের আসর বসেছিল। হৈমবতী চা খান না। খাওয়াতেও তেমন ভালোবাসেন না। মিষ্টান্ন রেঁধে ছিলেন কুটুম্বের জন্য।

টেবিলে র‍্যাকে চিন্ময়ের বইপত্র দেখে অনুপম সেদিন বলেছিল, 'যা হোক, তোমাদের মিলেছে ভালো। তুমিও যেমন বইয়ের ভক্ত, তোমার ইন্দুদিও তেমনি।'

চিন্ময় বলেছিল, 'ইন্দুদি বুঝি খুব বই পড়তে ভালবাসেন?'

অনুপম বলেছিল, 'ভালোবাসে মানে যদি বইয়ের মধ্যে পোকা হয়ে ঢুকে থাকতে পারত তাহলে ওর আরো সুবিধে হোত।'

চিন্ময় নিঃশব্দে হেসেছিল।

অনুপম বলেছিল, 'বাংলা ভাষায় এমন কোন বই নেই যা ও না পড়েছে। ধারে কাছে যত লাইব্রেরী আছে সব শেষ করে তবে শান্তি।'

স্বামীর অতিশয়োক্তিতে ইন্দু লজ্জিত হয়ে বলেছিল, 'কি যে বল, সব বই কেউ পড়তে পারে। আর আজকাল কত বই যেন এনে দাও তুমি, বই পড়বার কত সময় যেন আজকাল আমার হয়।'

অভিযোগের সুরটা অনুপমের ভালো লাগে নি, তবু চিন্ময়ের দিকে তাকিয়ে হেসেই বলেছিল, 'আপশোসটা শোন একবার। যদি হাতের কাছে বই থাকত আর সংসারের কাজকর্ম না থাকত তা'হলে পৃথিবীতে যত বই বেরিয়েছে তার একটা হিসাব নিকাশ না ক'রে তোমার ইন্দুদি কিছুতেই ছাড়ত না। বেশ এখন আর কি, এখন তো সুবিধাই হোল। একদিক থেকে তুমি বই জোগাও আর একদিক থেকে আমি সময় জোগাই। রান্নাবান্নাটা না হয় আমি নিজেই সারব।'

চিন্ময় ইন্দুর দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে হেসেছিল, 'আপনি যদি আমার সঙ্গে প্যাক্ট করেন অনুপমদা তা'হলে অত কষ্ট আপনাকে করতে হবে না।'

অনুপম বলেছিল, 'মানে তুমি রেঁধে দেবে?'

চিন্ময়ের মুখটা একটু আরক্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু পর মুহূর্তে সামলে নিয়ে বলেছিল, 'তা নয়, ইন্দুদিকে আর বই দেব না। কেবল আমি নয় কারো কাছ থেকেই যাতে উনি আর বই না পান, লাঠি হাতে তার পাহারা দেব।'

অনুপম এবার খুসি হয়ে হেসে উঠেছিল, 'না না অতটা নয়। কিছু কিছু বই দিয়ো। সত্যি এমন বইয়ের ভক্ত আর জুটি নেই।

আমার আরো জন দুই বন্ধুর বউয়েরও বই পড়বার অভ্যাস আছে। কিন্তু পাল্লায় এর সঙ্গে কেউ এঁটে উঠতে পারবে না।'

অনুপমের কথার ভঙ্গিতে গর্বের সুরটা বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

চিন্ময় সেই কথার উল্লেখ ক'রে বলল, 'সেদিন দেখলেন তো, বিদুষী স্ত্রীর জন্য অনুপমদা কেমন বুক ফুলিয়ে গর্ব ক'রে গেলেন?'

ইন্দু লজ্জিত হয়ে বলল, 'ওর ওই স্বভাব। বাইরের লোকের কাছে যখন তখন আমাকে এমন অপ্রস্তুত করেন যে, বলবার নয়।'

'বাইরের লোক' কথাটা চিন্ময়ের কাণে ভালো লাগল না। একটা খোঁচা দেওয়ার চেষ্টায় একটু শ্লেষের সুরে বলল, 'সারা গায়ে গয়না পরে আপনারা সেজেগুজে বেরোবেন আর গাঁটের টাকা খরচ করে আমরা একটু অহংকারও করতে পারব না?'

ইন্দু বলল, 'তা আর পারবে না কেন? আমাদের অলঙ্কার তো তোমাদের অহংকারের জন্যেই। গাঁটের টাকা কি সাধে খরচ করো তোমরা?'

ইন্দুর দিকে একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে চিন্ময় বলল, 'কিন্তু টাকা খরচ করেও অনুপমদা যে প্রাণভরে অহংকার করবেন তার আপনি জো রাখেন নি। বিদ্যা ছাড়া কোন ভূষণই বোধহয় আপনার পছন্দ নয়।'

ইন্দুর অলঙ্কারের বিরলতা লক্ষ্য করেই কথাগুলি বলল চিন্ময়। সাজ-সজ্জায় ইন্দু একটু বেশি রকম আটপৌরে। সাধারণ একখানা চওড়া খয়েরী পেড়ে সাদা খোলের শাড়ি ইন্দুর পরনে। হাতে শাঁখার সঙ্গে দুগাছা ক'রে চুড়ি। গলায় সরু একটু হার চিকচিক করছে। আর কানে লাল পাথর বসানো ফুল। কেবল ঘরেই নয়

বাইরে বেরুবার সময়ও ইন্দুর বেশ-বাসের বিশেষ পরিবর্তন হয় না—তাও চিন্ময় লক্ষ্য করেছে। সেদিন কোন এক আত্মীয় বাড়িতে বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে যাওয়ার সময় ছজনের দাম্পত্যালাপ সামান্য একটু কানে এসেছিল চিন্ময়ের।

অনুপমের বিরক্ত ক্রুদ্ধ স্বর শোনা যাচ্ছিল। 'যদি গয়না নাই পরো ওগুলি বাক্সবন্দী ক'রে রেখেছ কেন? মরবার সময়ে কি সঙ্গে নিয়ে যাবে?'

সিঁড়ি থেকে ইন্দুর হাস্যমধুর গলা ভেসে এসেছিল, 'না সে ভয় কোর না। ওগুলি তোমার নতুন বউয়ের জন্য তোলা থাকবে।'

ইন্দু বুঝতে পারল সেদিনের কথাগুলি চিন্ময় শুনেছে। চিন্ময়ের কথার জবাবে কৃত্রিম কোপে বলল, 'তোমার স্বভাব তো ভালো নয়, মেয়েদের মত আড়ি পাততে শিখেছ।'

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ওর বাড়াবাড়ি আর জীবনে যাবে না। শাড়ির চড়া রং আর গায়ের ভারি গয়না আমি মোটেই ভালো বাসিনে। কিন্তু আমি ভালো না বাসলে কি হবে—আচ্ছা তুমিই বল, এই বয়সে কি ও সব আমাকে মানায়?'

চিন্ময় বলল, 'বয়সের কথা তুলবেন না। আমার তো মনে হয় যে-কোন বয়সেই এই বেশ আপনাকে সব চেয়ে ভালো মানাত।'

ইন্দু কেমন যেন একটু অপ্রতিভ হোল, কিন্তু মনে মনে খুসিও কম হোল না, তার রুচির সঙ্গে এই ছেলেটির ভারি মিল আছে। একটু বাদে ইন্দু লজ্জিত হয়ে বলল, 'তোমার যেমন কথা। অন্য বয়সে তুমি আমাকে দেখেছ নাকি? অবশ্য কোন দিনই সাজ-সজ্জার পারিপাট্য আমি তেমন পছন্দ করতুম না।' র‍্যাক থেকে মোটা একখানা উপন্যাস ইন্দু নিজেই হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এবার যাই। গল্পে গল্পে তোমার কত ক্ষতি করে গেলাম।'

চিন্ময় হেসে বলল, 'কত ক্ষতি যে করলেন তার এখনো হিসেব নিই নি। তবে কিছু করেছেন বলেই মনে হচ্ছে। দাঁড়ান কিছু ক্ষতিপূরণ ক'রে দিয়ে তবে যাবেন।'

বই হাতে ইন্দু ফিরে দাঁড়িয়ে স্মিতহাস্তে বলল, 'ক্ষতিপূরণটা কি ভাবে হবে শুনি?'

চিন্ময় বলল, 'স্টোভ আছে, তক্তপোষের তলায় চা চিনিও আছে। কেবল দুধ আনতে হবে মার ঘর থেকে। আর হাত থাকতেও আমার হাত নেই।'

ইন্দু বলল, 'কেন হাতের কি হোল।'

চিন্ময় একটু হাসল, 'কি জানি কি হয়েছে। এ হাতে কিছুতেই চা হয় না। তবু একবার চেষ্টা করে দেখেছি। ভাবছি আর একবার—'

ইন্দু হেসে বলল, 'দরকার নেই আর একবারে। মায়েমা সেদিন বলছিলেন কবে নাকি তুমি একবার স্টোভ জ্বালাতে গিয়ে হাত পুড়িয়েছিলে। ফের যদি পোড়ে নিশ্চয়ই আমায় দোষ দেবেন।'

চা তৈরীর আয়োজনে লেগে গেল ইন্দুলেখা। পাশের ঘরে হৈমবতী ঘুমোচ্ছিলেন। স্টোভের শব্দে জেগে উঠে বিরক্তির স্বরে বললেন, 'এই ভর দুপুরে স্টোভ জ্বালতে বসল কে। চিনু বুঝি?'

ইন্দু সাড়া দিয়ে বলল, 'না মায়েমা, চিনু নয় আমি। ভয় নেই আপনার।'

হৈমবতী ওঘর থেকে বললেন, 'এই অসময়ে আবার বুঝি চায়ের বায়না ধরেছে? চা খেয়ে মিছিমিছি শরীর নষ্ট। ইচ্ছায় কি পেটভরে ভাত খেতে পারে না? বেশি আস্কারা দিয়ো না ইন্দু।'

দোতলার ঘরে মিনুরও দিবানিদ্রা ভেঙে গিয়েছিল। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে চিন্ময়ের ঘরের সামনে দাঁড়াল, 'কি করছ মা? কি হবে?'

ইন্দু হঠাৎ ধমক দিয়ে উঠল মেয়েকে, 'আঃ, তুমি আবার এখানে এলে কেন? যাও, ঘরে যাও শিগগির।'

আকস্মিক ধমকে মিনুর ঠোঁট ফুলে উঠল, 'বেশ যাচ্ছি। আর কিন্তু ডাকলেও আসব না তা বলে দিলুম।'

বলে মিনু এক ছুটে চলে গেল সেখান থেকে।

চিন্ময় বলল, 'কেন মিছিমিছি ধমক দিলেন। এখানে ডাকলেই হোত।'

ধমক দিয়ে ইন্দুও কম অপ্রস্তুত হয় নি। সত্যি মিনু কেবল দোরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। আর তো কোন দুষ্টুমি করেনি। ওকে অমন করে না তাড়ালেও হোত। ইন্দু অমনিতেই একটু লজ্জিত আর ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু চিন্ময়ের লোক-দেখানো ভালোমানুষিতায় এবার তার রীতিমত রাগ হোল, বলল, 'না ডাকাই ভালো হয়েছে। ছেলে মেয়ে তো তুমি ভালবাসো না।'

এমন সরাসরি আক্রমণে চিন্ময় মুহূর্তকাল হতবাক হয়ে রইল। ইন্দু নিজেও লজ্জিত হোল। ছি ছি আজ তার হয়েছে কি! চিন্ময়কে এমন খোলাখুলিভাবে কেন বলতে গেল কথাটা। চিন্ময় তার ছেলেমেয়েদের না ভালোবাসল তো কি হয়েছে। ছেলে-মেয়েদের আদর করবার লোকের অভাব আছে না কি তার?

কাপে চা ঢেলে চিন্ময়ের দিকে এগিয়ে দিল ইন্দু।

চিন্ময় বলল, 'ওকি, আপনি নিলেন না?'

ইন্দু বলল, 'আমার লাগবে না।'

চিন্ময় বলল, 'না না, সে কি হয়, তাহলে আমার কাপও রইল।' চিন্ময়ের জবরদস্তিতে বিরক্ত হয়ে ইন্দু নিজের কাপেও খানিকটা চা ঢেলে নিল।

চিন্ময় চায়ে একটু চুমুক দিয়ে বলল, 'কথাটা আপনি ঠিকই বলেছেন।'

ইন্দু গম্ভীরভাবে বলল, 'কিছু তুমি মনে কোরো না। আমার মন ঠিক ছিল না।'

চিন্ময় একটু হাসল, 'অনেক সময় বেঠিক মন থেকেই ঠিক কথা বেরোয়। সত্যিই ছেলেমেয়েদের আমি ভালোবাসতে পারিনে। পরিণত বয়সের পরিণত মনের মানুষ ছাড়া আমি মিশতে পারিনে কারো সঙ্গে।'

তর্কের অবকাশে ইন্দু এবার সোজা হয়ে বসল, নিজেও চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে নিল একটু, তারপর বলল, 'তুমি এমন করে বলছ যেন ছেলেমেয়েদের না ভালোবাসতে পারাই একটা অহংকারের কথা। কিন্তু তুমি যা ভাবছ তা নয়। বয়স যতটা হয়েছে তার তুলনায় তোমার নিজের মনও কম অপরিণত নয়।'

চিন্ময় বিস্মিত হয়ে বলল, 'অপরিণত!'

ইন্দু বলল, 'তা ছাড়া কি। ছেলেদের যারা ভালোবাসতে পারে না তারা নিজেরাই ছেলেমানুষ। বড়দের কাছে ছেলেরা চিরকাল স্নেহ পায় আদর-যত্ন পায়। আর বয়সে বড় হয়েও ভিতরে যারা ছোট থেকে যায় তারাই ছোট ছেলেদের হিংসে করে।' বেশ একটু ঝাঁজ ফুটে উঠল ইন্দুর কথায়। চায়ের কাপ রেখে সে এবার উঠে দাঁড়াল। চিন্ময়কে আঘাত দিতে পেরে এতক্ষণে মন তার প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। এতদিনে ছেলেমেয়েদের অপমানের প্রতিশোধ নিতে পেরেছে ইন্দু।

নিজের ঘরে এসে মেয়েকে ইন্দু জোর করে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, 'কুলের আচার রেখেছি তোর জন্য, খাবি?'

কলেজ মধ্য-কলকাতায়। চিন্ময়ের অধ্যাপনার সময় অবশ্য মধ্যাহ্নে নয়, সায়াহ্নের কমার্স বিভাগে। প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর

ছাত্রদের বাংলা সাহিত্যে অবহিত করে তুলবার ভার তার ওপর। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে পুরো তিনটি বছর বেকার কিংবা টিউশনি-সম্বল হয়ে থাকবার পর বহু কষ্টে আশিস্ সুপারিশ নিয়ে ঘোরাঘুরি করবার পর চিন্ময় এই মাস্টারীটি সংগ্রহ করতে পেরেছে। অবশ্য এর আগে মফঃস্বল শহরের কলেজগুলিতে চাকরির সম্ভাবনা মাঝে মাঝে যে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু যাই যাই করেও চিন্ময় মফঃস্বলে যায় নি। মাঝখানে দু একটি মাসিক সাপ্তাহিকে কাজ করেছে, খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখেছে, সস্তা মেসে হোটেলে অল্পব্যয়ে দিন কাটিয়েছে, তবু চিন্ময় কলকাতা থেকে নড়েনি।

বন্ধুরা তার এই অবিমৃষ্যকারিতার নিন্দা করেছে। 'বাইরের কোন কলেজ থেকে অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট নিয়ে এলে এতদিন যে এখানে বেশ ভালো চান্স পেয়ে যেতে হে।'

চিন্ময় মাথা নেড়েছে, 'একে মাস্টারী, তারপর মফঃস্বল, একেবার স্থায়ী হয়ে বসলে ফের আর নড়বার চড়বার ইচ্ছা থাকবে না। তার চেয়ে এই পাষাণপুরীর বেকার জীবন অনেক ভালো। আর কিছু না থাক, এখানকার জীবনে ধার আছে, স্রোত আছে। দিনগুলি এখানে ভারমন্থর নয়।'

সাংবাদিক বন্ধু নীলাম্বর সেন হেসে জবাব দিয়েছিল,—'তার মানে গুটি দুই ট্যুইশানি থাকায়, এখনো তোমার বাক্সে কবিতার খাতা আছে। কিন্তু আমি ভেবে পাইনে চিন্ময়, কলকাতার ওপর কেন তোমার এই মোহ। কলকাতা বলতে আমরা যা বুঝি আমরা যা খুঁজি তার কোনটির ওপর তোমার কোন আগ্রহ দেখা যায় না। তোমার খেলবার কি খেলা দেখবার মাঠ নেই, সভাসমিতি নেই, সিনেমা থিয়েটার একজিবিশন, কোন কিছুর বালাই নেই তোমার।

ভাল চাকরিবাকরি সংগ্রহ করে ক্যারিয়ার গড়ে তোলবার ঝোঁকও তোমার দেখা যায় না।'

চিন্ময় সায় দিয়ে বলেছিল, 'তা ঠিক।'

নীলাম্বর বলেছিল, 'ঠিক ছাড়া কি, তোমার কলকাতা তো মেসের একটি ঘরের একখানা তক্তপোষে, আর বড় জোর দু-একখানা বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তা তো যে কোন মফঃস্বল শহরে এমন কি যে কোন গ্রামে গেলেই পেতে।'

তা অবশ্য পাওয়া যেত। কিন্তু কলকাতা শহরের সস্তা কোন মেস-হোটেলের ঘরে ছারপোকাসঙ্কুল তক্তপোষে বসে শহরের যে ইসারা-আভাষটুকু মেলে তা তো অন্য কোথাও সম্ভব নয়। ···এখানে আর কিছু না থাক অজস্র সম্ভাবনা রয়েছে। যে কোন দিন যে কোন মুহূর্তে যে কোন কিছু ঘটে যেতে পারে, কোন বই পড়তে পড়তে, কোন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে, শহরের অখ্যাত গলির অখ্যাততম এক চায়ের দোকানে হাতলভাঙ্গা কাপে চা খেতে খেতে, হঠাৎ অদ্ভুত ভালো লেগে যেতে পারে আর সেই ভালো লাগার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে সমস্ত শহর আর পৃথিবী। সাংবাদিক নীলাম্বর কেবল সংবাদ চায়, হৈ চৈ চায়, ঘটনা ঘটাতে চায়, চিন্ময়ের ওসব কিছুতে দরকার নেই। নীলাম্বরের এই চাওয়া দেখে দেখেই তার অনেক সময় কাটে, বাকি সময়টুকু নিজের দিকে চেয়ে দেখতে মন্দ লাগে না।

কলেজের চাকরি নিয়েও চিন্ময়ের অভ্যাস ফেরেনি। ছাত্রদের সঙ্গে তার আলাপ কম, সহকর্মী অধ্যাপকদের দু'চারজন ছাড়া কারো সঙ্গে তার পরিচয় নেই।

বিকালের দিকে কলেজে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিল চিন্ময়। আলনা থেকে ফর্সা ধুতি পাঞ্জাবী পেড়ে নিচ্ছিল, হৈমবতী এসে ঘরে ঢুকলেন।

'বেরোচ্ছ বুঝি চিনু?'

'হ্যাঁ মা।'

হৈমবতী বললেন, 'আজ এত সকাল সকাল যে? একটু দাঁড়া, উনুন ধরিয়ে চা আর খাবার করে দিই।'

চিন্ময় বলল, 'দরকার নেই মা। এই তো খানিক আগে চা খেলাম।'

হৈমবতী একটু যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। দুপুরের পরে এসে ইন্দু স্টোভ ধরিয়েছিল কথাটা তাঁর আর একবার মনে পড়ল। স্টোভের শব্দ থামবার পর অনেকক্ষণ ধরে এদের কথাবার্তার শব্দ কানে গেছে। কেবল আজই নয় কদিন ধরেই চলছে এদের আলাপ আলোচনা।

একটু চুপ করে থেকে হৈমবতী বললেন, 'কেবল চায়ে তো আর পেট ভরে না। খাবারটাবার কিছু খেয়ে যা।'

'কিন্তু ক্ষিদে যে নেই মা'। চিন্ময় মৃদু হেসে আপত্তি করল।

হৈমবতী বললেন, 'এখন নেই, পরে খিদে পাবে। বেশ, খাবার করে দিচ্ছি, সঙ্গে নিয়ে যাও।'

চিন্ময় বলল, 'না মা, কৌটায় করে খাবার বয়ে নেওয়া আমার দ্বারা হবে না।'

হৈমবতী রুক্ষস্বরে বললেন, 'তা হবে কেন। বাইরের যত বাজে জিনিস খেয়ে শরীর আর পয়সা নষ্ট করবি।'

মায়ের এই তিরস্কারের কোন জবাব না দিয়ে চিন্ময় স্মিতমুখে বেরুতে উদ্যত হোল।

কিন্তু হৈমবতী ফের বাধা দিলেন, 'আর শোন। আমার কথা তোর গ্রাহ্যই হয় না, না?'

চিন্ময় থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি কথা মা।'

হৈমবতী বললেন, 'কদিন ধরে আবার সেই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। রাত্রে দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনে। সারা রাত কেবল এপাশ আর ওপাশ। কি ভাবে যে কাটাই তা আমিই জানি।'

চিন্ময় একটু লজ্জিত বোধ করল। সত্যিই মার অসুস্থতা সে খেয়াল করেনি। অথচ তার সামান্য একটু মাথা ধরলে হৈমবতী কত উদ্বিগ্ন, কত ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

চিন্ময় কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বলল, 'ফেরার পথে, আজই ওষুধ নিয়ে আসব মা। কল দিয়ে আসব ডাক্তারকে।'

হৈমবতী প্রসন্ন হলেন না, বরং আরও বিরক্ত হয়ে বললেন, 'দরকার নেই আমার ডাক্তারটাক্তারের, ডাক্তার এসে কি করবে শুনি।'

চিন্ময় বলল, 'ডাক্তাররা যা করে তাই করবে। ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা ক'রে যাবে।'

হৈমবতী আরও যেন উত্যক্ত হলেন, 'আহাহা, কেবল ওষুধ পথ্যেই রোগ সারে। বিশ্রাম চাইনা সেবা শুশ্রূষা চাই না, না? আমি তোমাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি কিন্তু, আমি নিজে কিছুতেই আর তোমার সংসারে দুবেলা হেঁসেল ঠেলতে পারব না। তুমি অন্য ব্যবস্থা যা করবার কর।'

হৈমবতীর বক্তব্যটা এবার আর আন্দাজ করা শক্ত নয়। তবু চিন্ময় শান্তভাবে বলল, 'তাই করব মা, এবার একটা বয়-টয় গোছের রেখে নেব। রান্নাবান্না, বাজার তাকে দিয়ে সবই চলবে, কলেজের বেয়ারা তারাপদের সঙ্গে কথা একরকম বলেও রেখেছি। কিন্তু মুসকিল হয়েছে তোমাকে নিয়ে, তোমার জাত বিচারটা তো এখনো যায়নি। যার-তার হাতে তো আর খেতে পারবে না তুমি।'

হৈমবতী বললেন, 'তাও পারব, কিন্তু ও সব বয়-টয়ের হাতে নয়। একটি মেয়ে তুই আমাকে এনে দে—হিন্দু হোক, খৃষ্টান

হোক, মেথর হোক, মুদ্দফরাস হোক আমার কিছুতে আপত্তি নাই। সকলের হাতেই খাব আমি। কিন্তু আর তুই দেরি করিসনে চিনু, আর দেরি করলে তোর বউ দেখে যাওয়া আমার কপালে আর হবে না। একদিন না একদিন সেই বিয়ে করবি, ছেলেপুলে ঘরসংসার সবই হবে, শুধু আমার ভাগ্যে—'

চিন্ময় ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা মা এবার যাই, সময় হয়ে গেল, রাত্রে ফিরে এসে তোমার ভাগ্যের কথা পরে আবার শুনব।'

হৈমবতী রাগ করে বললেন, 'কেবল পরে আর পরে। দু' তিন বছর ধরে এই তো করছিস। বিয়ে করবি কি আর বুড়ো হোয়ে গেলে ?'

একথার কোন জবাব না দিয়ে মার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল চিন্ময়। তারপর হাত তুলে চিৎপুরের একটা বাস থামিয়ে তাতে উঠে পড়ল।

বুড়ো মা'ও আজ তার বয়োবৃদ্ধির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। আর খানিকক্ষণ আগে ইন্দুদি বলছিলেন ছেলেমানুষ। কিন্তু এর আগে চিন্ময়কে কেউ কোনদিন ছেলেমানুষ বলেনি। বরং ছেলেবেলা থেকে উল্টোটাই সে এতদিন শুনে এসেছে। তার স্বভাবমন্থরতা শান্ত গাম্ভীর্য দেখে আত্মীয়স্বজনেরা বলাবলি করেছে, 'চিনুর কথা বলো না, ছেলেটা জন্মবুড়ো। ধরণধারণ চালচলন সব বুড়ো মানুষের কেবল চুলের রঙটাই যা কাঁচা।'

গোটা তিনেক ক্লাস সেরে কলেজ থেকে বেরুতে বেরুতে রাত হলো সাড়ে আটটা। ন-টার পরে ব্যোমকেশ বাবু ডিসপেন্সারীতে আর থাকেন না। চিন্ময় তাঁকে ধরবার জন্য তাড়াতাড়ি গিয়ে ট্রাম ধরল।

ডাঃ ব্যোমকেশ চৌধুরীর ডিসপেন্সারী শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে। এ অঞ্চলের নাম-করা প্রবীণ ডাক্তার ব্যোমকেশ বাবু। এম-এ পরীক্ষার মাস কয়েক আগে চিন্ময়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। মেসের ঘরে জ্বরে ভুগছিল ক'দিন ধ'রে। রুমমেট ব্যোমকেশবাবুকে ডেকে এনে চিকিৎসার ভার দিলেন।

চিন্ময় উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'পরীক্ষাটা দিতে পারব তো?'

ব্যোমকেশবাবু হেসে বলেছিলেন, 'আগে সুস্থ হয়ে নিন তার-পর পরীক্ষা।' তারপর হেসে বলেছিলেন, 'পারবেন বই কি নিশ্চয়ই পারবেন।'

সেই থেকে পরিচয়ের ধারাটা মোটামুটি অক্ষুণ্ণ আছে। . এই যাতায়াতে আর যোগাযোগ রাখায় ব্যোমকেশবাবুও ভারি খুসি হতেন, 'সুস্থ হবার পরেও ডাক্তারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, আজকাল এমন রোগী পাওয়া যায় না। আপনি শুধু ব্যতিক্রম।'

ব্যোমকেশ বাবুকে দেখে কৈশোরের সেই শ্যামা ঠাকুরদাকে মনে পড়ে চিন্ময়ের। কিন্তু শ্যামদাস ভট্টাচার্যের সঙ্গে ব্যোমকেশ ডাক্তারের অনেক প্রভেদ। শ্যামাদাস ছিলেন শুকনো ন্যাড়া খেজুর গাছ, আর ব্যোমকেশ শাখাপ্রশাখা পত্রবহুল অশ্বত্থ। গাড়ি বাড়ি ছেলেমেয়ে নাতি নাতনীর অরণ্যে বনস্পতি! তবু কোথায় যেন মিল আছে দুজনের মধ্যে। আর সে মিল কেবল পাকা চুলের মিল নয়।

চিন্ময়কে দেখে ডাক্তারবাবু উল্লসিত হয়ে উঠলেন, 'আসুন, আসুন। এই মুহূর্তে আপনার কথাই ভাবছিলাম। অনেক কাল বাঁচবেন।'

চিন্ময় সামনের চেয়ারে বসে পড়ে বলল, 'আপনার ওষুধ আর আশীর্বাদের জোরে তা হয়ত বাঁচব, কিন্তু আপনার কথা শুনে তো

টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাস করতে হয়। যখনই এখানে আসি শুনি একটু আগে আমার কথাই ভাবছিলেন।'

ব্যোমকেশবাবু এ কথার কোন জবাব না দিয়ে একটু হাসলেন। সরু একটা টুলের ওপর জন দুই রোগী তখনো বসে ছিল। তাদের অসুখ সম্বন্ধে কয়েকটা বাঁধা প্রশ্ন ক'রে কম্পাউণ্ডার অমূল্যকে ডেকে মুখে মুখে ওষুধের নাম বলে দিলেন।

তারপর রোগীরা বিদায় নিয়ে গেলে বললেন, 'ওসব বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা রাখুন মশাই। তর্কে তর্কে রাত ভোর হবে, কোন মীমাংসা হবে না। তার চেয়ে বলুন হঠাৎ এমন গা ঢাকা দিয়ে রয়েছেন কেন? অনেকদিন আসেন না এদিকে।'

চিন্ময় বলল, 'এবার আসব। আসতে আসতে প্রায় একেবারে আপনাদের পাড়ার মধ্যে এসে পড়েছি। শেষ পর্যন্ত দু'খানা ঘর মিলেছে রাজবল্লভ স্ট্রীটে।

ব্যোমকেশবাবু হেসে বললেন, 'তাই বলুন। কিন্তু কেবল তো ঘর মিলেছে তাতেই আপনার পাত্তা পাওয়া যায় না। এর পর ঘরণী মিললে কি আর বাইরে বেরোবেন আপনি?'

চিন্ময়ের সঙ্গে বন্ধুর মতই আলাপ করেন ব্যোমকেশবাবু। যেন চিন্ময়ের তিনি সমবয়সী, বার্ধক্যটা নেহাৎই মেক-আপ মাত্র। পাকা চুলটা পরচুলা।

চিন্ময় হেসে বলল, 'আপনার ভয় নেই। ঘরণী মিলবার তেমন কোন সম্ভাবনা দেখছিনে।'

হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গেল চিন্ময়ের, বলল, 'ভালো কথা, আমাকে কি খুব ছেলেমানুষ বলে মনে হয় আপনার?'

ব্যোমকেশবাবু হাসলেন, 'কেন বলুন তো? এমন একটা বাজে কথা কে বলল আপনাকে?'

চিন্ময় মৃদুকণ্ঠে বলল, 'একজন মহিলা বলেছিলেন।'

ব্যোমকেশ বাবু বললেন, 'ও মহিলা, তাই বলুন। এবার বুঝতে পেরেছি।'

চিন্ময় একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি বুঝতে পেরেছেন?'

ব্যোমকেশবাবু হাসলেন, 'কেন আপনিও কি পারেন নি? মেয়েরা ছেলেদের কখন ছেলেমানুষ বলে জানেন না?'

'না।'

ব্যোমকেশবাবু বললেন, 'যখন ছেলেদের কাছ থেকে তারা যথেষ্ট পরিমাণে পুরুষ মানুষের মত ব্যবহার চায়, অথচ পায় না।'

চিন্ময় একটু কাল আরক্ত আর নির্বাক হয়ে থেকে তীব্র প্রতিবাদ ক'রে উঠল, 'না না না, তিনি মোটেই ও অর্থে কথাটা বলেন নি। জানেন, ছেলেমানুষ বলে তিনি আমাকে গাল দিয়েছেন। বলেছেন, আমি মেয়েমানুষের মতই আত্মপরায়ণ অনুদার অপরিণত মনের মানুষ।' তারপর একটু হেসে বলল, 'আপনার কি মনে হয় ডাক্তার বাবু? আমি সত্যিই কি তাই?'

ব্যোমকেশবাবু খানিকটা কৌতূহল মেশানো চোখে চিন্ময়ের মুখের দিকে একটু কাল তাকিয়ে থেকে কি যেন বুঝে নিতে চাইলেন, তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'কেন তিনি হঠাৎ গায়ে পড়ে আপনাকে এমন কতকগুলি গালাগাল দিতে গেলেন বলুন তো?'

চিন্ময় বলল, 'কি জানি। তাঁর ছেলেমেয়েদের আমি তেমন ভালোবাসতে পারিনি বলেই বোধহয়।'

ব্যোমকেশ বাবু বললেন, 'ও, তাঁর ছেলেমেয়েও আছে। কিন্তু যাঁর ছেলেমেয়ে থাকে তাঁর তো ছেলেমানুষ সম্বন্ধে এমন খারাপ ধারণা থাকবার কথা নয়। গালাগালগুলি আপনার বানিয়ে বলা।'

দেয়ালঘড়িতে ঢং করে একটা শব্দ হোল। নাড়ে ন'টা।

ব্যোমকেশবাবু একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন, বললেন, 'এবার উঠতে হয়। আপনি এত দেরি ক'রে আসেন যে, সে-আসার কোন মানেই হয় না। বেটার লেটু থ্যান্‌ নেভার কথাটা সব জায়গায় খাটেনা। অন্তত ডাক্তারখানায় তো নয়ই। রোগের গোড়াতেই ডাক্তার ডাকতে হয়।'

এতক্ষণে খেয়াল হোল চিন্ময়ের, মার অসুখের কথা ডাক্তার বাবুর কাছে মোটে তোলাই হয়নি। মনে মনে ভারি লজ্জিত হোল। ছিঃ, সবচেয়ে আগেই তো তাঁর অসুখের কথাটা বলা উচিত ছিল। তা না ক'রে কেবল বাজে গল্পে সময় কাটিয়েছে।

সেই অনৌচিত্যের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যই যেন একটু বেশি ব্যাকুলতার ভঙ্গিতে চিন্ময় বলে উঠল, 'আর একটু দেরি করতে হবে ডাক্তার বাবু। মার বড় অসুখ।'

ব্যোমকেশবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'অসুখ? সে কি! এতক্ষণ সেকথা বলেন নি তো? আপনার মা এসেছেন বুঝি এখানে? কি অসুখ তাঁর?'

চিন্ময় সবিস্তারে তার মার কথা বলল। ব্যোমকেশবাবু শুনে বললেন, 'ও, ক্রনিক হার্ট ডিজিজ, তা ঘাবড়াবার কি আছে। কিছু ভাববেন না। আজ তো ডিসপেন্সারী বন্ধ হয়ে গেল। কাল পরশু একদিন এসে ওষুধ নিয়ে যাবেন। চলুন।'

ব্যোমকেশবাবুর ঔদাসীন্যে একটু যেন আহত হোল চিন্ময়। নিজের মার ওপর নিজের উদাসীনতা সয়, কিন্তু অন্যের ঔদাসীন্য সহ্য হয় না।

ব্যোমকেশবাবুর দিকে তাকিয়ে একটু কঠিন স্বরেই চিন্ময় বলল, 'না ডাক্তার বাবু, পরশু নয়, কাল সকালেই আপনি যাবেন আমাদের ওখানে। গিয়ে দেখেশুনে ওষুধপথ্যের ব্যবস্থা করবেন। অন্য কোথাও যাওয়ার আগে—'

ব্যোমকেশবাবু আর একবার তাকালেন চিন্ময়ের দিকে, তারপর শান্তভাবে বললেন, 'বেশ তো, সবচেয়ে আগেই আপনার ওখানে যাওয়া যাবে। তাতে কি হয়েছে। ঠিকানাটা দিয়ে যান।'

চিন্ময়ের সঙ্গেই বেরুলেন ব্যোমকেশবাবু। ষাটের ওপরে হবে বয়স। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ চেহারা। পরণে মিহি ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে। বেশ মানিয়েছে শুভ্র পরিচ্ছদে। গলায় শুধু কালো একটা টেথিসস্কোপ ঝোলানো, যেন সত্যিই সর্পভূষণ মহেশ্বরের মূর্তি।

পুব মুখে একটু এগিয়ে ব্যোমকেশ বাবু মোড় ঘুরলেন। চিন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, আসুন। কাল দেখা হবে।'

সামনের একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন ব্যোমকেশ বাবু। চিন্ময় একটু কাল দাঁড়িয়ে কি দেখল। গলিটা বাড়ির পথ নয় ব্যোমকেশ বাবুর। হয়তো কোন রোগীর বাড়ি হবে।

হেঁটে হেঁটে চিন্ময়ও খানিক বাদে নিজের বাসার সামনে এসে পৌঁছাল। রাত ন'টা বাজতে না বাজতেই ভূপতি-ভবনের সদর বন্ধ হয়ে যায়। কলেজ থেকে ফিরে আসতে আসতে রোজই চিন্ময়ের একটু রাত হয়। কিন্তু তাই বলে সদর তার জন্য খোলা থাকে না, এদিক থেকে ভারি কড়া বিধিনিষেধ আছে অনুপমের। সন্ধ্যার পরে অন্য কেউ না দিলে অনুপম নিজে এসে দোর বন্ধ ক'রে দিয়ে যায়। আর রোজ এসে কড়া নাড়তে হয় চিন্ময়কে। হৈমবতী এসে দোর খুলে দেন।

আজও বার দুই তিন আস্তে আস্তে কড়া নাড়ল চিন্ময়। একটু বাদে সদরের প্যাসেজে আলো জ্বলে উঠল। শব্দ হোল দোর খোলার। হৈমবতী নয়, ইন্দুলেখা। সদরের খিল খুলে দিয়ে একপাশে একটু সরে দাঁড়াল ইন্দু। চিন্ময় একবার না তাকিয়ে পারল না। রাত্রির কি

আলাদা রূপ আছে? নইলে চওড়া কালোপেড়ে সাধারণ আটপৌরে একখানা শাড়িতে ইন্দুকে এমন সুন্দর দেখাচ্ছে কেন? মাথায় আধখানা আঁচল। মুখের নিখুঁত ডৌলটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কানের লাল পাথর বসানো ফুলে বিদ্যুতের দ্যুতি ঠিকরে পড়েছে। তাতে সমস্ত মুখখানাই যেন এক নতুন রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। পানের রসে কোমল পাতলা ঠোঁট দুটি আরক্ত। সারাদিনের পরিশ্রম আর রাত্রের খাওয়ার পরে একটু যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছে ইন্দুকে। কিন্তু সে ক্লান্তি যেন প্রসাধনের মতই ইন্দুর মুখখানাকে শ্রীমণ্ডিত ক'রে তুলেছে।

মাথার আঁচলটা আর একটু টেনে দিয়ে ইন্দু বলল, 'চাকরি হোল এতক্ষণে?'

চিন্ময় বলল, 'হোল। কিন্তু আপনি কেন কষ্ট করে উঠে এলেন।'

ইন্দু মৃদু হাসল, 'আমি কষ্ট ক'রে না এলে তোমাকে কষ্ট ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে হোত। মায়েমা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

চিন্ময় বলল, 'কেবল মা'রই তো দোষ নয়। অনুপমদারও নাক ডাকার শব্দ আসছে। দোর খুলে দেওয়ার জন্য তাঁরই কিন্তু জেগে থাকা উচিত।'

ইন্দু বলল, 'ভারি দায় পড়েছে। তুমি দেরি ক'রে ফিরবে, আর তোমার জন্য আর একজন বুঝি রাত জেগে বসে থাকবে রোজ? সরো, খিলটা দিয়ে আসি।'

চিন্ময় বলল, 'কিন্তু একজনকে না একজনকে তো শেষ পর্যন্ত জাগতেই হয়। তার চেয়ে দোরটা ভেজিয়ে রাখাই তো ভালো।'

ইন্দু মুখ টিপে হাসল, 'তোমার তো ভারি সর্বনেশে পরামর্শ। রাত দুপুর পর্যন্ত তিনি বাড়ির দোর খোলা রাখুন, আর এদিকে চোর ঢুকে সব চুরি ক'রে নিয়ে যাক, না?'

চোর ঠেকাবার জন্য সদরের ভারি হুড়কোটা সন্তর্পণে এঁটে দিল ইন্দু। আর দেয়াল ঘেষে চিন্ময় আস্তে আস্তে ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

পরদিন, বেলা বারটার সময় গলির মুখে ব্যোমকেশবাবুর গাড়ি এসে দাঁড়াল। খবর পেয়ে চিন্ময় গিয়ে তাঁকে নিয়ে এল এগিয়ে। ওষুধের ছোট একটা হ্যাণ্ডব্যাগ ব্যোমকেশ বাবুই বয়ে নিচ্ছিলেন, চিন্ময় তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ওটা আমাকে দিন।'

ব্যোমকেশবাবু বললেন, 'না, না।'

কিন্তু চিন্ময় তাঁর হাত থেকে ব্যাগটাকে ততক্ষণে নিয়ে নিয়েছে।

ব্যোমকেশবাবু বললেন, 'একটু দেরি হয়ে গেল। রোগীরা ডাক্তারদের সময়ানুবর্তী হতে দেয় না, জানেনই তো। খানিক আগে একটা কার্বাঙ্কল কেস এসেছিল, অস্ত্রাঘাত করতে হোল।'

ব্যোমকেশবাবু একটু হাসলেন।

চিন্ময় ডাক্তারবাবুকে নিজের ঘরে এনে প্রথমে বসাল। তারপর হৈমবতীকে ডেকে এনে পরিচয় করিয়ে দিল তাঁর সঙ্গে, বলল, 'ডাক্তারবাবু। তোমাকে এঁর কথা অনেক বলেছি মা। আমার বিশেষ বন্ধু।'

হৈমবতী বললেন, 'ছিঃ, বন্ধু বলছ কেন চিনু, বয়সে কত বড়। বল গুরুজন, অভিভাবক।'

চিন্ময় আর ব্যোমকেশবাবু পরস্পারের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন।

চিন্ময় বলল, 'গুরুজন অভিভাবকেরা কি বন্ধু নয় মা?'

ব্যোমকেশবাবু বললেন, 'আমাদের দেশে বন্ধুর কেবল একটি অর্থই আছে চিন্ময় বাবু—বয়স্য।' তারপর হৈমবতীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার কি কষ্ট বলুন তো মা?'

হৈমবতী বললেন, 'কষ্ট? আমার অন্য কোন কষ্ট নেই ডাক্তার-বাবু। সমস্ত কষ্টের মূল এই ছেলে। কথায় একেবারে অবাধ্য।'

বোমকেশবাবু একটু হাসলেন, 'এ তো ভালো কথা নয়, চিন্ময় বাবু।'

এরপর রোগের কথা উঠল। অনেক দিন ধরেই শ্বাসকষ্টে ভুগছেন হৈমবতী। ব্লাড প্রেসারের দোষও আছে।

বোমকেশবাবু বললেন, 'আপনাকে একটু শুতে হবে যে মা। আর কোন মেয়েছেলে নেই বুঝি?'

হৈমবতী বললেন, 'না।'

চিন্ময় হঠাৎ বলল, 'একটু বসুন ডাক্তার বাবু। আমি ইন্দুদিকে ডেকে নিয়ে আসছি।'

দ্রুতপায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল চিন্ময়। তারপর দোতলায় ইন্দুদের ঘরে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল। সদ্য স্নান সেরে এসেছে ইন্দু। পিঠময় ভিজে চুলের রাশ ছড়ান। দোরের দিকে পিছন ফিরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ইন্দু সযত্নে সিঁথিতে সিঁদুর পরছিল। আয়নায় চিন্ময়ের মুগ্ধ চোখের ছায়া পড়তেই মুহূর্তকাল সিঁদুরের কৌটার মধ্যে আঙুল দুটি ইন্দুর অনড় হয়ে রইল। চিন্ময় ফিরে যাচ্ছিল, ইন্দু মাথায় আঁচল তুলে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে তাঁকে ডাকল, 'ব্যাপার কি, এসেই চলে যাচ্ছ যে।'

চিন্ময় আড়ষ্ট স্বরে বলল, 'ডাক্তারবাবু এসেছেন মাকে দেখতে। কাছে একজন মেয়েছেলে থাকলে ভালো হয়। তাই এসেছিলাম—'

ইন্দু মুখ টিপে হাসল, 'ও, তাই বল। কিন্তু সময় নেই, অসময় নেই, পরের ঘরের মেয়েছেলেকে কতদিন আর এমন ডাকাডাকি করে ফিরবে? তার চেয়ে—।'

তারপর স্বর বদলে শঙ্কিত উদ্বেগের সুরে বলল, 'কিন্তু হঠাৎ ডাক্তার

যে? কি হোল মায়েমার? এই খানিকক্ষণ আগেও না তাঁকে দেখলাম সন্ধ্যা করছেন বসে বসে।'

চিন্ময় বলল, 'বিশেষ কিছু নয়। সেই পুরোন অসুখই। আচ্ছা, আপনি আপনার কাজ করুন।'

কিন্তু ইন্দু প্রায় চিন্ময়ের পায়ে পায়েই নেমে এল নিচে, তার-পর যে-ঘরে রোগিণীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা চলছিল সেই ঘরে গিয়ে ঢুকল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে বেরিয়ে এল চিন্ময়।

দশ বার মিনিট বাদে ব্যোমকেশ বাবুও বেরিয়ে এলেন, বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই। নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া চলা-ফেরা করলে সেরে যাবে। একটা টনিক লিখে দিচ্ছি—।'

চিন্ময় তাঁকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল। স্টার্ট দেওয়ার আগে ব্যোমকেশবাবু চিন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আসবেন নাকি এখন?'

চিন্ময় বলল, 'না, এখন থাক। কলেজ থেকে ফেরার পথেই যাব।'

ব্যোমকেশবাবু বললেন, 'বেশ তখনই নিয়ে আসবেন ওষুধটা।'

চিন্ময় এবার পকেট থেকে টাকা বের করল।

ব্যোমকেশবাবু বললেন, 'ও আবার কি?'

চিন্ময় বলল, 'আপনার—।'

ব্যোমকেশবাবু বললেন, 'উঁহু, ওটা আমার নয়। ওটা আপনার পকেটেই রেখে দিন।'

চিন্ময় ফের আর একবার অনুরোধ করায় ব্যোমকেশবাবু বিরক্তির ভঙ্গিতে বললেন, 'আঃ, বলছি রাখুন।'

চিন্ময় পাঁচ টাকার নোট দু'খানা পকেটে রাখতে রাখতে বলল, 'ধমকটা কিন্তু গুরুজনের মতই গুরুগম্ভীর হয়ে পড়ল। বয়স্যোচিত হোল না।'

ব্যোমকেশবাবু একটু হাসলেন, 'ও। কিন্তু বয়স্য হিসেবেও যে কিছু বলবার নেই তা নয়।'

চিন্ময় বলল, 'আছে নাকি? বলুন না।'

ব্যোমকেশবাবু বললেন, 'আরো এগিয়ে আসুন তাহ'লে, বক্তব্যটা বড়ই গোপনীয়।'

তারপর চিন্ময়ের পিঠে হাত রেখে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস ক'রে বললেন, 'আপনাকে কে ছেলেমানুষ বলেছিলেন আজ টের পেলাম। আপনি অবশ্য পরিচয় করিয়ে দেন নি। কিন্তু আমি পরিচয় পেয়ে গেছি।'

চিন্ময় লজ্জিত হয়ে বলল, 'কি যা তা বলছেন!'

দিন কতক বাদে হৈমবতী ছেলেকে বললেন, 'কাল তো রবিবার। কলেজ-টলেজ সব বন্ধ।'

চিন্ময় বই থেকে মুখ তুলে বলল, 'হ্যাঁ, তাই কি?'

হৈমবতী বললেন, 'কাল যেন কোন বন্ধু-টন্ধুর সঙ্গে আবার চলে যেও না কোথাও। আমি তোমাকে আগেই বলে রাখছি বাপু।'

চিন্ময় হেসে বলল, 'বেশ তো, না গেলাম। বন্ধুবান্ধব আমার তো খুব বেশি নয় মা। আর তাদের সঙ্গে বেরোইও কম। কিন্তু তোমার বোধ হয় ধারণা আমি খুব আড্ডাবাজ।'

হৈমবতী মুখ গম্ভীর করে বললেন, 'আগে ছিলিনে। আজকাল হয়েছিস।'

চিন্ময় বলল, 'তাই নাকি? আমার স্বভাবের এতবড় একটা মৌলিক পরিবর্তন হোল অথচ আমি তো কই কিছু টের পেলাম না। যতদূর মনে হয় আমি তো আগের মত ঘরেই থাকি।'

হৈমবতী বললেন, 'তা থাক। কিন্তু আড্ডা দেওয়ার যদি ইচ্ছা থাকে তা ঘরে বসেও দেওয়া যায়, বাইরে গিয়েও দেওয়া যায়।'

চিন্ময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মা'র দিকে তাকাল, 'তার মানে?'

কিন্তু মানেটা হৈমবতী আর খুলে বললেন না, অন্য কথা পাড়লেন. 'যা বলছিলাম, কাল বিকালে আর অন্য কোন কাজকর্ম হাতে রেখ না। অনুপমের সংগে কাল তোমাকে গড়পার যেতে হবে।'

চিন্ময় ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, 'গড়পার কেন?'

হৈমবতী এবার একটু হাসলেন, 'বাঃ, গড়পারেই তো অনুপমের মামাশ্বশুর থাকেন। কাল এসেছিলেন ভদ্রলোক। কথায় বার্তায় আলাপে ব্যবহারে বেশ মানুষটি। তোর জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে করে উঠে গেলেন। আমি কথা দিয়েছি কাল তুই আর অনুপম গিয়ে দেখে আসবি মেয়েটিকে, পছন্দ হলে তখন কথাবার্তা বলা যাবে।' অনুপম বলে, তার জন্য আটকাবে না। তারপর একটু থেমে বললেন, 'তা ছাড়া ছেলের বিয়ে দিয়ে বড়লোক হওয়ার সাধ তো আমার নেই। বংশ যদি ভালো হয়, দেখতে শুনতে মেয়েটি যদি মোটামুটি সুন্দরী হয় তাহ'লেই হোল। এই বাজারে কোন ভদ্রলোককে পণ যৌতুকের জন্য পীড়াপীড়ি আমি কিছুতেই করতে যাব না বাপু। তাতে যে যা খুসি বলুক। আহা, ভদ্রলোকের এর আগে দু'দুটি মেয়েকে পার করতে হয়েছে। সোজা কথা? তাদের দিকটাও তো ভাবতে হবে। তবে লোকে যাতে নিন্দা করতে না পারে—।'

হৈমবতী আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, চিন্ময় বাধা দিয়ে বলল, 'কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস না করে তুমি আগেই ওদের কথা দিতে গেলে কেন?'

হৈমবতী ছেলের দিকে একটু কাল চুপ করে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'কি কথা দিয়েছি? কাল তোরা দেখতে যাবি সেই কথা।

কি দোষ হয়েছে তাতে? আমি কি সেটুকু কথাবার্তাও কারো সঙ্গে বলতে পারিনে?'

চিন্ময় বিরক্ত হয়ে বলল, 'পারো, কিন্তু অনর্থক ওসব কথার মধ্যে গিয়ে লাভ কি মা। আমি তো গোড়া থেকেই বলছি বিয়ে আমি করব না। অন্তত এখন তো নয়ই।'

হৈমবতী চটে উঠলেন, 'এখন নয় কখন? আমি মরলে? বেশ কর না কর, ভদ্রলোককে আমি যখন বলেছি, তুমি না যাও ইন্দুকে সঙ্গে নিয়ে আমি গিয়ে দেখে আসব।'

চিন্ময় বলল, 'সেই ভালো।'

কিন্তু পরদিন অনুপম চিন্ময়কে হাত ধরে টেনে তুলল 'ঈস্ যাবনা, বললেই হোল! আমাদের মুখের কথার বুঝি একটা দাম নেই।'

চিন্ময় বলল, 'দাম নেই তা তো আমি বলছিনে। নিজেরা কথা দিয়েছেন, নিজেরা গিয়ে দেখে আসুন, তাহলেই হবে।'

অনুপম বলল, 'তা কি করে হয় ভায়া। আজকাল আর সেদিন নেই, নিজেদের জিনিস নিজেরা বেছে-টেছে আনাই ভালো, না হলে ঠকতে হয়, দেখনা আমার দশা?'

ইন্দু কাছেই ছিল, হেসে বলল, 'কেন, তুমি কি ঠকেছ না কি?'

অনুপম চিন্ময়ের দিকে তাকিয়ে হাসি চেপে বলল, 'অহংকারখানা একবার দেখলে? উনি যার স্কন্ধগত হয়েছেন সে কি আর ঠকতে পারে? সে একেবারে বর্তে গেছে। তা এক হিসাবে ঠকেছি ছাড়া কি।'

চিন্ময় বলল, 'কোন, হিসাবে ঠকেছেন বলে মনে হয়।'

অনুপম আড়চোখে একবার ইন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের মত নিজে দেখে শুনে যাচাই বাছাই করবার চান্স পেলে কি এমন

কালো মেয়ে ঘরে আনতাম ভেবেছ? কুঁচবরণ কন্যা আর মেঘবরণ চুল ঠিক খুঁজে খুঁজে বের করতাম। তাছাড়া মেয়ের খুব নভেল নাটক পড়া অভ্যাস আছে শুনলে গোড়াতেই একেবারে রিজেক্ট করে দিতাম। মেয়েদের মনে একেই তো ঘোরপ্যাঁচের অন্ত নেই। তারপর যদি একরাশ ছাপার অক্ষর সেখানে গিয়ে ঢোকে তাহলে আর রক্ষা নেই, সংসার ধর্ম সব গেল।'

ইন্দু কোন কথা ব[illegible]না। পরিহাসের ভঙ্গিতে বললেও স্বামীর এ সব অভিযোগের সবটুকুই যে পরিহাস নয়, তার সত্য বিশ্বাস, তা ইন্দুর জানতে বাকি নেই। দীর্ঘ চোদ্দ বছর একসঙ্গে বাস করেও স্বামীর সঙ্গে নিজের জীবনকে যে সম্পূর্ণ মিলিয়ে নিতে পারে নি, স্বামীর রুচি বুদ্ধির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারেনি, এ খোঁটা সুযোগ পেলেই অনুপম তাকে দিতে ছাড়ে না। কিন্তু নালিশ কি কেবল অনুপমেরই আছে? ইন্দুর নেই?

চিন্ময় ইন্দুর ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে অনুপমকে বলল, 'দিলেন তো ওঁকে চটিয়ে? আপনি একেবারে ঠাকুরদার আমলের লোক। মেয়েদের লেখাপড়া দু'চোখে দেখতে পারেন না।'

চিন্ময়ের বলবার ভঙ্গিতে কোথায় যেন একটু খোঁচা ছিল। ভিতরে ভিতরে অনুপম খুব চটল। কিন্তু রাগ চেপে বলল, 'না দেখতে পেরে কি আর জো আছে ভায়া? দেখতে দেখতে ক্রমে সবই অভ্যাস হয়ে যায়। এখন আমি মেয়েদের লেখাপড়ার ভারি পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি। আজকাল বরং ঠিক উল্টোটা মনে হয়। লেখাপড়া মেয়েদেরই মানায়, পুরুষদের মানায় না।'

চিন্ময় কৌতুকের স্বরে বলল, 'তাই নাকি?'

অনুপম বলল, 'নিশ্চয়ই। যত নরম হাতের নরম মনের কাজ সব মেয়েদের দিয়ে করানোই ভালো। ঘরের কোণে বসে মেয়েরা বই

পড়ুক, বই লিখুক, ছবি আঁকুক কিন্তু পুরুষে যেন ওসবের ধার দিয়েও না যায়। তাদের কাজ আলাদা, তাদের ফীল্ড আলাদা।'

ইন্দু বলল, 'সত্যিই ?'

অনুপম বলল, 'তা ছাড়া কি। তারা খেলার মাঠে খেলবে, যুদ্ধের মাঠে সুখে প্রাণ দেবে প্রাণ নেবে। পুরুষ মানুষের তাই কাজ। পৌরুষ বলতে আমি তাই বুঝি। এ ছাড়া আর এক জাতের পুরুষও আছে। তারা সংসারের একটা কোণ নিয়ে থাকে। আমার মতে তারা মেয়েলী পুরুষ, আসল পুরুষ নয়।'

ইন্দু পিছন থেকে বলল, 'আঃ কি যা তা বলছ। তোমার মতটাই পৃথিবীর সকলের মত নয়।'

অনুপম মুখ ফিরিয়ে বলল, 'অন্তত তোমার মত নয় তা জানি।'

অনুপমের আক্রমণের লক্ষ্য যে সরাসরি চিন্ময় তা কারো বুঝতে বাকি ছিল না। মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে চিন্ময় বলল, 'কেবল ইন্দুদি কেন, আমিও ঠিক আপনার মতে সায় দিতে পারছি না।'

অনুপম বলল, 'তা তো পারবেই না। আচ্ছা, তোমার নিজের পক্ষের ওকালতিটা এবার শুনি।'

চিন্ময় তর্কটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'সেটা ভাল দেখাবে না। তার চেয়ে একজন উকিল বরং আপনাকে আমি পাঠাব। সময়মত আমার হয়ে তিনিই সব বলবেন।'

পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর এবার অনুকম্পা হোল অনুপমের। অটুট আত্মপ্রত্যয়ে সে হো হো করে হেসে উঠল, তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'দেখলে তো, চিন্ময়ের মুরোদ দেখলে একবার ? নিজের কথাটুকু পর্যন্ত নিজের মুখে বলতে পারে না। আসলে বলবার কিছু থাকলে তো বলবে। চিনু ঠিকই বলেছে। ওর জন্য একজন উকিলই ঠিক করে আনা দরকার। তা বাসবী বেশ বলতে

কইতে পারে। তার হাতে পড়লে শ্রীমান একসঙ্গে মক্কেল আর মুহুরি বনে থাকবেন, কি বল।'

অনুপম হাসতে লাগল।

ইন্দুও সামান্য হাসল। কিন্তু সে-হাসিতে যেন অন্তরের সায় নেই। চিন্ময়ের ওপর কেমন যেন একটা আক্রোশে মন ভরে উঠল ইন্দুর। বাকযুদ্ধে কেন চিন্ময় এমন নিঃশব্দে পরাজয় মানল। এ যেন কেবল চিন্ময়ের পরাজয় নয়, তাতে ইন্দুরও লজ্জা আছে। কেন, চিন্ময়েরও কি কিছু বলবার ছিল না? সে কি বলতে পারত না— কেবল হাতের কাজই পুরুষের নয়, মাথার কাজও তার? সে কেবল ক্ষত্রিয় নয়, সে ব্রাহ্মণও?

চিন্ময়ের কোন আপত্তিই টিঁকল না। নাছোড়বান্দা অনুপম জোর করে তাকে বাসে টেনে তুলল, বলল, 'দেখ, শত হলেও আমি ল্যাণ্ডলর্ড, তুমি টেন্যাণ্ট্। তা ছাড়া যথার্থ পুরুষের আর একটা লক্ষণ তখন তোমাকে বলা হয়নি। তারা মেয়ে দেখবার নিমন্ত্রণ পেলে সঙ্গে সঙ্গে সেটা গ্রহণ করে। মেয়ে দেখে পছন্দ হোক আর না হোক, বিয়ে করুক আর না করুক, মেয়েওয়ালার বাড়ি থেকে বেশ এক পেট খেয়েও আসে।'

গড়পারে অনুপমের সম্পর্কিত মামাশ্বশুর ক্ষীরোদচন্দ্র বসু গলির মোড় পর্যন্ত এগিয়ে এসে চিন্ময়দের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তাদের দেখে পরম আপ্যায়নে বাড়ির ভিতরে ডেকে নিয়ে গেলেন। বেঁটে-খাট মানুষটি। অর্ধেক মাথায় টাক। খুব ভদ্রলোক বলেই মনে হলো চিন্ময়ের।

কাস্টমস্‌এ কাজ করেন। শ' তিনেক টাকা মাইনে পান। কিন্তু ছেলেমেয়ের সংখ্যা বেশি হওয়ায় ভদ্রলোক এঁটে উঠতে পারছেন না। তবে লোক ভারি বৈষয়িক আর বুদ্ধিমান। এর আগে দুটি মেয়েকে মোটামুটি ভালো ভাবেই পাত্রস্থ করেছেন। কিন্তু সকলের চেয়ে এই মেয়েটিই ভালো। আই-এ পড়ছে। গানবাজনাও জানে। বাসে আসতে আসতে শ্যালিকার প্রশংসায় অনুপম প্রায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে।

জলখাবারের পব শেষ হওয়ার পর কনে দেখাবার পালা আরম্ভ হোল। বাসবীর মা সুহাসিনী রুগ্ন শরীর নিয়ে মেয়েকে যথাসাধ্য সাজিয়েগুজিয়ে দিলেন। অনুপমকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ইন্দুকে যদি নিয়ে আসতে সঙ্গে করে আমার ভারি উপকার হোত। সে-ই করতে পারত এসব।'

অনুপম বলল. 'ভাববেন না মামীমা। আজকাল ছেলেমেয়েদের জন্য কারো কিছু করতে হয় না, কি বল টুলু?'

বাসবী বলল, 'সে কথা বুঝেও করবার গরজ কমে কই আপনাদের।'

অনুপম হেসে বলল, 'বাপরে, এযে একেবারে মিলিটারি মেজাজ। যিনি দেখতে এসেছেন তাঁকেও সারাটা পথ টেনে হিঁচড়ে আনতে হয়েছে। আবার যিনি দেখা দেবেন তাঁরও দেখছি সেই অবস্থা। ছিঃ, অমন করে না। ঠাণ্ডা মেজাজে, লক্ষ্মী মেয়ের মত এস আমার সঙ্গে।'

অনুপমের পিছনে পিছনে বাসবী এসে ঘরে ঢুকল। ক্ষীরোদবাবু তক্তপোষে বসে ছিলেন. অনুপম তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার কাজ থাকলে আপনি বরং তা সেরে আসুন। ওদের আলাপ পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য তো আমিই আছি। আর সবই তো একরকম নিজেদের মধ্যে। চিন্ময় আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তা তো জানেনই।'

ক্ষীরদবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, সেদিন গিয়ে সবই শুনেছি ইন্দুর কাছে। তোমরা এর মধ্যে আছ বলেই তো—।'

বাবার এই নম্রতা, অতিরিক্ত সে জন্যের ভঙ্গি বাসবীর চোখে ভারি বিসদৃশ লাগল। যাঁর হাঁকডাকে মা আর ভাইবোনেরা সবাই অস্থির তাঁর কেন এই বৈষ্ণবিক দীনতা? হোলই বা কলেজের একজন প্রফেসার, তার জন্য এত কৃত-কৃতার্থ হওয়ার কি আছে? অন্তু মঞ্জুবা এমন অনেক সত্যনাশকরা ছোকরা প্রফেসারকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে।

ক্ষীরোদবাবু বেরিয়ে গেলে অনুপম বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাসবী, বোস।'

বাসবী অনুপমদের সামনের চেয়ারে বসে পড়ল। চিন্ময় লক্ষ্য করল মেয়েটি মুখখানা নিচু করে রাখলেও তার ভঙ্গিতে নম্রতা নেই, বরং কেমন যেন একটু অহংকার আর ঔদ্ধত্যের ভাবই সমস্ত চেহারায়, বসবার ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে। অথচ আঠের-উনিশ বছরের নিতান্ত সাধারণ-দর্শনা এই মেয়েটির মনে গর্ব কি করে জন্মাল তা ভেবে চিন্ময় বিস্মিত না হয়ে পারল না। একটু ফ্যাকাসে রঙ ছাড়া আর কোন কিছুই মেয়েটির তেমন সুন্দর বলা চলে না। মুখের গড়ন চ্যাপ্টা ধরণের. নাকটিও তাই, চোখ দুটিও একটু ছোট ছোটই। একহারা দীর্ঘ চেহারায় শুধু নারীসুলভ কমনীয়তার একটু অভাব আছে বলেই মনে হোল। প্রথম দৃষ্টিতেই মেয়েটির প্রতি কেমন একটু বিরূপতা অনুভব করল চিন্ময়।

অনুপম একটি সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'বাঃ, এমন চুপচাপ রইলে কেন চিন্ময়। কিছু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস কর।'

চিন্ময় বলল, 'জিজ্ঞাসা? জিজ্ঞাসা আবার কি করব। আপনিই করুন না।'

অনুপম বলল, 'বাঃ আচ্ছা মানুষ যা হোক। দেখতে এলে তুমি, আর জিজ্ঞাসাবাদ বুঝি আমি করব।'

চিন্ময় এবার একটু হাসল, 'করলেনই না হয়। এ সব ব্যাপারে কতকগুলি বাঁধাধরা কোশ্চেন তো আছেই, সেগুলি আপনার মুখেও যেমন শোনাবে আমার মুখেও তেমনি।'

অনুপম বলল, 'বাঁধাধরা প্রশ্নই যে করতে হবে তার কি মানে আছে। ইচ্ছা করলে ঘোরানো জড়ানো নতুন ধরণের পেপারও সেট্ করতে পার। আমাদের ক্যাণ্ডিডেট্ খুব ওয়েল-প্রিপেয়ার্ড।'

চিন্ময় হেসে বলল, 'তা হোক, আমার তেমন কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই।'

অপমানে সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে গেল বাসবীর। একটু চুপ করে থেকে চেয়ার ছেড়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অনুপমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি তাহলে এবার যাই জামাইবাবু।'

অনুপম বাধা দিয়ে বলল, 'সেকি হে, কোন আলাপ পরিচয়ই যে হোলনা এখনো, বসো বসো।'

বাসবী তেমনি উদ্ধত ভঙ্গিতে জবাব দিল 'না, বসে তো অনেকক্ষণ রইলাম। আমার কাজ আছে।' বলে বাসবী দোরের দিকে এগুতে শুরু করল।

এবার একটু যেন লজ্জা বোধ করল চিন্ময়, কিন্তু তার চেয়েও বেশি বোধ করল কৌতুক। না, সে যা ভেবেছিল তা নয়, অহংকার-টহংকার কিছু নয়, মেয়েটি আসলে ভারি সরল। এ ধরণের অভিমানিনী দু'চারটি ছাত্রীকে তার এর আগে পড়াতে হয়েছে।

অনুপম এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে ফিরিয়ে নিয়ে এল বাসবীকে। বলল, 'ছিঃ টুলু, অমন করে না। ভালো হয়ে বসো। একজন ভদ্রলোক আলাপ করতে এসেছেন তোমার সঙ্গে, আর তুমি কিনা—।'

বাসবী বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল দোরের আড়ালে মা এসে দাঁড়িয়েছেন। চোখের ইসারায় অভদ্রতা করতে নিষেধ করছেন তাকে। একটু বাদে ক্ষীরোদবাবুও এসে ঢুকলেন। মেয়ের আচরণের কৈফিয়ৎ হিসাবে বললেন, 'বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে আদুরে মেয়ে হোল ও। ভালো হয়ে বস বাসবী। ওঁরা যা জিজ্ঞেস করছেন জবাব দাও।'

বাসবী রীতিমত অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে শক্ত হয়ে চেয়ারে বসে রইল।

ক্ষীরোদবাবু স্নেহার্দ্র স্বরে বললেন, 'আমার সব কটি ছেলে মেয়ের মধ্যে এইটিই হোল সবচেয়ে ইনটেলিজেন্ট। ক্লাসেও বেশ ভাল রেজাল্ট করে। ম্যাট্রিকুলেশনে দশ নম্বরের জন্য ফার্স্ট ডিভিশনটা পায়নি। মার্ক সীট আনিয়ে দেখেছিলাম। ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠবার সময় লজিকে ফার্স্ট হয়েছে। অন্যান্য সাবজেক্টেও এ্যাভারেজে সিক্সটি পার্সেণ্ট ছিল, তাই না বাসবী? আমার মেয়ে লজিকে ফার্স্ট হয়, আর লজিককে আমি যমের মত ভয় করেছি।'

ক্ষীরোদবাবু হাসলেন।

চিন্ময়ও মৃদু হাসল। এরপর বাসবীর সঙ্গে আলাপ না করাটা অভদ্রতা হবে। কিন্তু এই ফরমায়েস মাফিক আলাপটা কেমন যেন তার কাছে হাস্যকর লাগতে লাগল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'কি সাবজেক্ট আপনার?'

বাসবী জবাব দিল, 'হিস্ট্রি, লজিক আর সিভিক্স্।'

চিন্ময় বলল, 'কি পড়তে আপনার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে?'

'সবই ভালো লাগে।'

চিন্ময় একটু হাসল, 'সবই ভালো লাগে? কথাটা বোধ হয় ভেবে বলেন নি।'

বাসবী অদ্ভুত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, 'অত ভাবতে আমার ভালো লাগে না।'

কথার চেয়ে ভঙ্গিটুকুতে যেন আরও বেশি ছেলেমানুষি ফুটে উঠল বাসবীর।

চিন্ময় হাসল, 'বেশ তো, ভালো না লাগলে ভাববেন না। এমন একটা বয়স আসবে যখন ভাবতে ভালই লাগবে, কিংবা না ভালো লাগলেও ভাবতে হবে।'

বাসবী এবার অবাক হয়ে চিন্ময়ের মুখের দিকে তাকাল। কে এই লোকটি। বয়স তো খুব বেশি বলে মনে হয় না।. অথচ বয়স্ক লোকের মত উপদেশ দেয়। কিন্তু কমবয়সী পুরুষের মুখে বয়স্ক লোকের উপদেশও যেন অন্য রকম শোনায়। তা শুনে রাগ হয় না, বিরক্তি হয় না, বরং কৌতুক আর মজা লাগে। উপদেশই দিক আর যাই দিক হাসিটুকু ভারি মিষ্টি। আর ভদ্রলোকের চোখ দুটিও ভারি সুন্দর। খানিক আগে যে বিদ্বেষ জমেছিল বাসবীর মনে, তার চিহ্নমাত্রও রইল না। মৃদু হেসে মুখ নিচু করে রইল বাসবী।

এর পর চিন্ময় অনুপমের দিকে চেয়ে বলল, 'এবার ওঠা যাক অনুপমদা। ওঁকে আর আটকে রাখব না।'

অনুপম বলল, 'সেকি, এরই মধ্যে সব হয়ে গেল? আর কিছু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করবে না?'

চিন্ময় হেসে উঠে দাঁড়াল, 'এই তো করলুম। পেপার লেংথী করবার অভ্যাস আমার নেই। তাছাড়া প্রশ্নপত্র দীর্ঘই হোক আর হ্রস্বই হোক শতকরা ষাট নম্বর তো ওর বাঁধাই আছে।'

বাসবীর ইচ্ছা হোল আর একবার চোখ তোলে, কিন্তু পারল না।

যাওয়ার সময় অনুপমকে একান্তে ডেকে ক্ষীরোদবাবু আর সুহাসিনী জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রকম বুঝলে।'

অনুপম বলল, 'এর আর বোঝাবুঝির কি আছে? চিন্ময়ের নিজের মুখেই তো শুনলেন। যেমন তেমন পাশ নয়, একশ'র মধ্যে ষাট নম্বর পেয়ে পাশ।'

নিশ্চিত এবং আশ্বস্ত হয়ে ক্ষীরোদবাবু আর সুহাসিনী দুজনেই হাসলেন।

ফেরার পথে অনুপম বলল, 'কি রকম, আমি তোমাকে আগেই বলিনি? এক অক্ষরও কি বাড়িয়ে বলেছি? তুমি এবার বাসায় ফিরবে তো?'

চিন্ময় বলল, 'হ্যাঁ।'

অনুপম বলল, 'আচ্ছা তুমি এগোও, আমি একটু বৈঠকখানা হয়ে যাব।'

বাসায় আসার সঙ্গে সঙ্গে হৈমবতী জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন দেখলি?'

চিন্ময় বলল, 'অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? সবই বলব।'

বলল ইন্দুর কাছে। ইন্দুরও কৌতূহল কম নয়। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও নিচে নেমে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি রকম, পছন্দ হোল তো আমাদের টুলুকে—বাসবী দেবীকে?'

চিন্ময় বলল, 'বাসবী দেবী নয়, টুলুই বলুন। বড্ড ছেলেমানুষ।'

ইন্দু একটু অবাক হয়ে বলল, 'সে কি বলছ? আমার যখন বিয়ে হয় টুলুর বয়স তখন পাঁচ ছয় বছরের কম হবে না। মামীমারা যত কমিয়েই বলুন, ঊনিশ পেরিয়ে গেছে ও মেয়ের বয়স।'

চিন্ময় বলল, 'তাহলেই বা কি, ঊনিশই বলুন আর ঊনত্রিশই বলুন, ত্রিশ পেরিয়ে না আসা পর্যন্ত মেয়েদের বুদ্ধিশুদ্ধি হয় না।'

বারান্দায় বসে সুপুরি কাটছিলেন হৈমবতী, ছেলের কথা শুনে বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'যত সব সৃষ্টিছাড়া কথা তোর মুখে। আমরা তো জানি যার হয় না নয়তে, তার হয় না নব্বুইতে। বুদ্ধি যাদের হয়

তাদের অল্প বয়সেই হয়। উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে ওর কাছে ছেলে মানুষ হোল। বিয়ে হলে এতদিন তিন ছেলের মা হয়ে যেত না?'

ইন্দু হেসে বলল, 'নাও, এবার জবাব দাও।'

চিন্ময় বলল, 'জবাব আবার কি দেব। ছেলের মা হলেই যেন তার ছেলেমানুষি ঘোচে। তাহলে তো আমার মারও ঘুচত।'

ইন্দু এবার হেসে উঠল, 'শুনুন মায়েমা, কথা শুনুন আপনার ছেলের! ওর কাছে কেবল টুলুই নয়, আপনিও নাকি ছেলেমানুষ।'

হেমবতী কিন্তু হাসিতে যোগ দিলেন না. বললেন, 'তোমরাই শোন বাছা, আমার ওসব ভালো লাগে না।'

ইন্দুর মুখে কিসের যেন একটা ছায়া পড়ল। একটু চুপ করে থেকে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে বলল, 'ওসব বাজে কথা রাখ! টুলুকে অপছন্দ হওয়ার তোমার কোন কারণই নেই। দেখতে শুনতে গৃহস্থ ঘরের মেয়ে যেমন হয় তেমনি। ছাত্রী হিসাবেও শুনেছি বেশ ভালো।'

চিন্ময় বলল, 'তাতো আমি অস্বীকার করছিনে। আপত্তি কেবল পাত্রী হিসাবেই।'

বাসবীর রূপ গুণ যোগ্যতার পক্ষ নিয়ে আরো খানিকক্ষণ তর্ক করে ইন্দু উঠে গেল। তাদের চেষ্টা সফল হয়নি। মামা মামীমার কাছে অপ্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু এর জন্য যতখানি দুঃখ বোধ করার কথা ছিল, মনে মনে ইন্দু যেন ততটা দুঃখিত হোল না। বরং একটা অকারণ প্রসন্নতায় মন যেন ভরে রইল। চিন্ময়ের কথা মনে পড়ায় হাসি পেল তার। মায়েমা ঠিকই বলেছেন, যত সব সৃষ্টিছাড়া কথা ওর। ত্রিশের নিচে নাকি মেয়েদের মন ঠিক মত পরিণতি পায় না। চিন্ময়কে জিজ্ঞেস করতে হবে ছেলেদের মনের পরিণতি কোন বয়সে হয়।'

মনে মনে হাসলো ইন্দু।

মিন্নুর কাণ্ড দেখ। আয়নাটার ওপর কি রকম নোংরা হাতের ছাপ দিয়েছে। উনি এসে দেখলে আর বাঁচাবেন না। আঁচল দিয়ে ইন্দু আয়নাটি মুছে পরিষ্কার করে ফেলল। এবার ঠিক হয়েছে। তারপর কি ভেবে, আঁচল দিয়ে নিজের মুখখানাও ইন্দু একটু মুছে নিল। চিন্ময় সেদিন বলছিল ইন্দুর মুখ দেখলে নাকি বোঝা যায় না যে তার বয়স ত্রিশ হয়েছে। শুধু মুখের কথা শুনলে টের পাওয়া যায়। বানিয়ে বানিয়ে এত বাজে আজগুবি কথাও বলতে পারে চিন্ময়।

ড্রেসিং টেবিলের বড় দেরাজটির চাবি নষ্ট হয়ে গেছে। আর সেই সুযোগে ওটাকে নিজের দেরাজ বানিয়েছে তিলু। একটা ঘুড়ির লাটাই পর্যন্ত ওর ভিতরে ঢুকিয়ে রেখেছে। উনি দেখলে রাগ করবেন। উনাকে রান্না। দ্রুত হাতে দেরাজটা একটু গুছোবার চেষ্টা করল ইন্দু। সে-ও নোংরামি দেখতে পারে না।

পা টিপে টিপে কে যেন দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ভিতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না। কে আবার। ইন্দু মুখ টিপে হাসল, কিন্তু মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'কে? অধ্যাপক মশাই নাকি?' এই অসময়ে হঠাৎ পাড়া-পড়শীর খোঁজ নেওয়ার কথা মনে পড়ল যে? আজ বুঝি কলেজ নেই? লজ্জা ক'রে ওখানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, আসুন, ভিতরে আসুন।'

বলে ঘাড় ফিরিয়ে স্মিতমুখে বাইরের দিকে তাকাল ইন্দু। কিন্তু তাকিয়েই অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে জিভ কেটে বলল, 'ও তুমি!'

অনুপম বলল, 'হ্যাঁ বড়ই আফশোষের কথা। অধ্যাপক মশাই নই।'

ইন্দু লজ্জিত হয়ে বলল, 'কি যে বল। তুমি না বলে গিয়েছিলে, আজ একটু রাত হবে ফিরতে। ক্লোজিং-এর সময়—'

অনুপম বলল, 'না, আজ একটু সকাল সকালই চলে এলাম। শরীরটা ভালো লাগছিল না।'

ইন্দু বলল, 'তা বেশ করেছ। পরের চাকরির জন্য তুমি যেমন খাট পৃথিবীতে বোধ হয় আর কেউ তেমন খাটেনা। ওকি, ভিতরে এস। ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে যে।'

অনুপম একটু হাসল, 'আমাকে তো আর ঘরে যাওয়ার জন্য ডাকছিলে না।'

ইন্দুর হাসিমুখ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। স্বামীর দিকে একটকাল চুপ করে তাকিয়ে থেকে ফের মুখে হাসি টেনে বলল, 'ঘরের লোককে বুঝি আবার ঘটা ক'রে ঘরে ডেকে আনবার দরকার হয়।'

আর কোন কথা না বলে জুতোর ফিতে খুলে অনুপম ঠিক নির্দিষ্ট জায়গাটিতে পেরেকের সঙ্গে জুতোজোড়া সযত্নে ঝুলিয়ে রেখে ঘরে ঢুকল। ইন্দু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে স্বামীর গায়ে হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করে বলল, 'না, জ্বরটর কিছু নয়।'

অনুপমের বুকপকেটে পকেট-ডায়েরী আর দুটো ঝুলপকেটে ছোট-বড় কাগজের মোড়ক। ইন্দুর সব গৃহস্থালীর ফরমায়েস। স্বামীর গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিজের হাতে ইন্দু সেগুলিকে একটি একটি করে বার করতে লাগল। ছেলেমেয়েরা পাশের ঘরে পড়তে বসেছে। না ডাকলে ওরা এখন আর কেউ এঘরে ঢুকবে না। তিলু মিনু দু'জনেই বাপকে খুব ভয় করে।

সবচেয়ে শেষে চায়ের প্যাকেট। পকেট থেকে সেটাকে আর বের করা যায় না। অনেক কসরত করে সেটিকে বাইরে আনল ইন্দু, তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, একটা কথা বলবে? অমন ক'রে বাইরে দাঁড়িয়েছিলে কেন? তুমি তো কোনদিন অমন কর না।'

অনুপম বলল, 'অনেককাল বাদে তোমাকে অতক্ষণ ধ'রে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বড় ভালো লাগল। ভাবলাম ধার ক'রে ড্রেসিং টেবিলটা কেনা এতদিনে সার্থক হয়েছে। আগে তো বেশভূষা আর বিলাসিতার জিনিস মোটেই দু'চোখে দেখতে পারতে না—'

ইন্দু বাধা দিয়ে প্রতিবাদ করল, 'আর এখন বুঝি খুব পারি? সেজে-গুজে পটের বিবি সেজে দিনরাত বসে থাকি আজকাল, তাই বুঝি তোমার ধারণা?'

অনুপম বলল, 'তা নয়। তবু একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে তোমার আজকাল বেশ নজর এসেছে, বললে হবে কি! আর একটা জিনিস আমার মনে হয়। এই ক'মাসের মধ্যে তোমার বয়সটাও যেন হঠাৎ বেশ ক'বছর কমে গেছে।'

অনুপমের কথার ভঙ্গিতে হঠাৎ ধক্ ক'রে উঠল ইন্দুর বুকের মধ্যে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বলল, 'কি যে বল! তোমার গায়েও চিন্ময়ের হাওয়া লাগল নাকি?'

অনুপম সোজা স্ত্রীর দিকে তাকাল, 'কেন চিন্ময়ও ওই কথা বলে বুঝি?'

অদ্ভুত একটু হাসল অনুপম।

খোঁচা খেয়ে ইন্দুও তাকাল স্বামীর দিকে, তারপর জেদী মেয়ের মত ঘাড় বাঁকাল, 'বলেই তো। পাগলে কি না বলে। কিন্তু মেয়েদের বয়স একবার বাড়লে তো কোনদিন কমে না। তবে কোন কোন বয়সে দু'-একজন পুরুষের দৃষ্টিশক্তি কমে, আর না হয় তাদের আক্কেল বুদ্ধির তবিলে কমতি পড়ে।'

অনুপম আর কোন কথা না বলে অফিসের জামা-কাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরল। তারপর গামছা নিয়ে নিচের বাথরুমে গেল হাত মুখ ধুতে।

'কি মাঐমা, রান্নাবাড়া সব শেষ হয়ে গেছে ?'

ওপর থেকেই আলাপের সূচনাটা কাণে গেল ইন্দুর। তারপর আর কোন কথা শুনবার চেষ্টা না করে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

স্বামীকে আর ছেলেমেয়েদের খাইয়ে, নিজের খাওয়া শেষ ক'রে ঘরে আসতে রাত গোটা দশেক বেজে গেল। অন্যদিন অনুপম এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। আজ ঘুমায়নি। চুলের কাটায় আধাআধি চিহ্ন দেওয়া বালিসের তলা থেকে মোটা নাভেলখানা হাতে নিয়ে শুয়ে শুয়ে তার পাতা ওল্টাচ্ছে। পান মুখে দিয়ে পা ঝুলিয়ে ইন্দু তক্তপোষে স্বামীর গা-ঘেঁষে বসল। তারপর হেসে বলল, 'ব্যাপার কি। আজ কি পুবের সূর্য পশ্চিমে উঠল নাকি, তুমি নভেল পড়ছ।'

অনুপম বলল, 'দেখছিলাম উল্টে-পাল্টে, কি তোমরা পাও বইয়ের মধ্যে। বইয়ের নাম 'শাখা-প্রশাখা।' মানে কি হোল ? এতে কি গাছ-গাছালির কথা আছে নাকি ?'

হাসি চেপে ইন্দু বলল, 'কি জানি কিসের কথা আছে। প্রায় আধাআধি পড়লাম, বই ভরে কেবল কিলকিল করে মানুষ আর তাদের মুখভরা কেবল কথা আর কথা। মাথামুণ্ডু কি যে বলতে চায় বোঝা শক্ত। যাই বল, শরৎ চাটুয্যের পরে আর বাংলা নভেল পড়ে তেমন জুৎ পেলাম না। চিন্ময় অবশ্য তর্ক করে এ নাকি আমার বুঝবার দোষ, রসবোধ বৃদ্ধি না পাওয়ার লক্ষণ।—শরৎ বাবু যে সমাজ, যে সময় নিয়ে লিখেছেন—'

অনুপম বাধা দিয়ে বলল, 'শরৎবাবু খুব ভালো লিখতেন নাকি ?'

ইন্দু এরপর প্রসঙ্গ বদলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মাঐমা তখন কি বলছিলেন তোমাকে, কি যেন শুনলাম একটু—'তাদের নিষেধ ক'রে দিয়ো, তাদের জানিয়ে দিও—' কাদের কি জানাবার কথা বললেন ?'

অনুপম বইখানা সশব্দে বন্ধ ক'রে দূরে সরিয়ে রেখে উঠে বসে উত্তেজিতভাবে বলল, 'কাদের আবার? তোমার মামাকে নিষেধ ক'রে দিতে বললেন। বাসবীকে নাকি চিন্ময়ের পছন্দ হয়নি। ও নাকি স্পষ্টই ওর মাকে সেকথা বলে দিয়েছে। অথচ সেখানে এমন ভাব করল, এমন হেসে হেসে কথা বলল, যেন দেখামাত্র সে প্রেমে পড়ে গেছে বাসবীর। এখন বলে কিনা পছন্দ হয়নি; রাস্কেল কোথাকার। আমি আরো ওঁদের জোর ভরসা দিয়েছি, এ সম্বন্ধ ক'রে দেবই। এখন আমার মুখ থাকে কোথায়?'

ইন্দু বলতে যাচ্ছিল, কেন তুমি তাঁদের অমন ভরসা দিতে গেলে? কিন্তু স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা আর বলল না। মুখ রাখবার ভাবনায় অনুপমের মুখ তখন ক্রোধে বিদ্বেষে নানাভাবে আচ্ছন্ন।

ইন্দু একটুকাল কি চিন্তা ক'রে বলল, 'যদি আমার ওপর ভার দাও, যদি আমার ওপর নির্ভর করতে পার, আমি তোমার মুখ রাখবার ব্যবস্থা করি। দেখ আজকালকার দিনের ঘটকালি অত সোজা নয়, তার জন্য অনেক কল কারসাজির দরকার।'

অনুপম বলল, 'কি রকম?'

ইন্দু বলল, 'তিলু মিনুদের মশারিটা ফেলে দিয়ে আসি তারপর বলব। তুমি যেন এর মধ্যে ঘুমিয়ে প'ড় না।'

পাশের ঘরে তিলক আর মিনু ঘুমায়। কোন কোন দিন মিনু মার কাছেও শোয়। কোন কোন দিন বা ভোরের দিকে ছেলে-মেয়েদের ওঘর থেকে তুলে আনে অনুপম। মুখে মুখে ইংরেজী কবিতা মুখস্থ করায়, নিজের ছেলেবেলায় শেখা সংস্কৃত প্রবচনগুলি ওদের শিখে নিতে বলে।

ছেলেমেয়েদের মশারি টাঙিয়ে দিতে এসে ইন্দু বলল, 'দেখ কাণ্ড! ভারি বিশ্রী শোয়ার অভ্যাস তিলুর। ছোট বোনকে পা দিয়ে

ঠেলতে ঠেলতে একেবারে তক্তপোষের এক কিনারে নিয়ে এসেছে। নিজেও শুয়ে আছে আড়াআড়িভাবে। 'এই তিলু, ভালো হয়ে শো, ভালো হয়ে শো শিগ্‌গির।'

টেনে টেনে ছেলেমেয়েকে ভালো করে শুইয়ে দিল ইন্দু। ছেলের মাথায় কপালে একটু হাত বুলাল। তিলক ভিতরে ভিতরে বড় হিংসুটে। প্রায়ই বলে, 'তুমি কেবল মিনুকেই বেশি ভালাবাস। আমাকে দেখতে পার না।'

মিনু হওয়ার পর ইন্দুকে ডাকত, 'বোনের মা।'

'আর তোর?'

'আমার কিছু না।'

আর একদিন। তখন মিনু হয়নি। এখন মিনুর যে-বয়স তিলুর বয়স তখন তাই। ছেলেকে নিয়ে নিজের মামার বাড়ি বেড়াতে গেছে ইন্দু। ছেলেমেয়ে নিয়ে মামাত বোন সুলতাও এসেছে বাপের বাড়ি। তিলু যেবার হয়, তার পরের বছর হয়েছে সুলতার ছেলে টাটু। সুলতা যেই বলেছে তোমার মাসিমা, অমনি টাটু কাছে এসে কোল-ঘেঁষে দাঁড়াল। ইন্দু তাকে কোলে তুলে নিতেই টাটু তার গলা জড়িয়ে ধ'রে জিজ্ঞাসা করল, 'মাসিমা? তুমি আমাল মাসিমা? আমাল?'

ইন্দু হেসে বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোর ছেলে তো ভারি মায়াবী হয়েছে লতা।'

তারপর বোনপোকে আশ্বাস দিল ইন্দু, 'হ্যাঁগো হ্যাঁ তোমাল, তোমাল।'

তিলু একটু দূরে আর সব মাসতুতো ভাইবোনেদের সঙ্গে খেলছিল, ক্ষ্যাপার মত ছুটে এল, 'নামাও, নামাও, কোল থেকে নামাও ওকে।'

প্রথমে ধমক দিল ইন্দু, 'ছি, অমন করে নাকি।'

কিন্তু কে শোনে কার ধমক? তিলক তখন তার মাকে আঁচড়াতে কামড়াতে শুরু করেছে।'

সুলতা বলল, 'দিদি তোমার শাড়িখানা তো গেল। শিগগির টাটুকে নামিয়ে দাও তিলুকে শান্ত কর।'

ইন্দু ছেলেকে বুঝাবার চেষ্টা করেছিল, 'ছি, অমন করে নাকি, লোকে কি বলে। আচ্ছা, তুমিও না হয় এই কোলে এস। আমি তোমার মা আর টাটুর মাসিমা। কেমন?'

কিন্তু তিলু তাতে রাজী হোল না সে তার মাকে অন্য কারো মাসিমা হ'তেও দেবে না। শেষ পর্যন্ত টাটুকে নামিয়ে দিয়ে তবে শান্তি। হিংসুটে ছেলের জন্য বোনের কাছে সেদিন ভারি লজ্জিত হয়েছিল ইন্দু।

মশারিটা ফেলে দেওয়ার আগে ইন্দু সস্নেহে আর একবার ছেলের মুখের দিকে তাকাল। ঠিক অনুপমের মত মুখের আদল হয়েছে ওর, তার মতই সুন্দর ফর্সা রঙ স্বভাবও অনেকটা বাপেরই পাচ্ছে। বড় হয়ে ওকি অনুপমের মতই হবে? ভারি মিল আছে কিন্তু দুজনের মধ্যে। আচ্ছা, অনুপম বড় হয়েও অনেক ব্যাপারে তিলুর মত রয়ে গেছে। মনে মনে একটু হাসল ইন্দু। হিংসার বেলায় পুরুষ মানুষ বোধহয় একটু ছেলেমানুষই থাকে। নইলে চিন্ময়কে অনুপম হিংসা করবে কেন। অনুপম বা কি আর চিন্ময় বা কি।'

ছেলেমেয়ের মশারি ফেলে দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল ইন্দু। যা ভেবেছে তাই। অনুপম ঘুমিয়ে পড়েছে। খেয়ে উঠে বেশিক্ষণ আর সে জেগে থাকতে পারেনা। কিন্তু নিজে জেগে থেকে ইন্দু বহুক্ষণ ধরে মতলবটা ঠিক করল। যেমন করে পারুক, বাসবীর সঙ্গে চিন্ময়ের বিয়ে সে দেবেই। তাহলে সব সন্দেহের নিরসন হবে, সব সমস্যার

সমাধান হবে। যদি অল্প ব্যয়ে সম্বন্ধটা ক'রে দিতে পারে তা'হলে মামা-মামীমাও খুব উপকৃত হবেন, খুসি হবেন ইন্দুর ওপর। অল্প বয়সে বাপ-মা মারা গেছেন। বাপ-মার কর্তব্য মামা-মামীই তো করেছেন। যেটুকুই হোক লেখাপড়া শিখিয়েছেন, ভালো ঘর বর দেখে বিয়ে দিয়েছেন। এখন ইন্দুরও তো একটা কর্তব্য বলে জিনিস আছে। কিন্তু অনুপমের মত সেকেলে ঘটকঠাকুর সাজলে চলবে না ইন্দুর। এ বড় শক্ত ঠাঁই। বিয়ের আগে দু'জনকে প্রেমে পড়াতে হবে। বারবার দেখাশোনা মেলামেশার পর চিন্ময়ের মনের ওই খুঁৎ খুঁৎ ভাবটুকু আর থাকবে না। ভালোবাসায় সব খুঁৎ তলিয়ে যাবে। চিন্ময় সেদিন বলেছিল সিনেমায় যাবার কথা। ইন্দুর তো সময় নেই, তেমন ইচ্ছাও করে না। কিন্তু বাসবী আর চিন্ময়ের জন্য ওকে যেতেই হবে। সিনেমা ঘরে কোন প্রণয়মূলক নাটক দেখবে চিন্ময় আর বাসবী পাশাপাশি বসে। ইন্দু একপাশে সরে থাকবে, আর না হয় মাঝখানে থাকবে হাইফেন হয়ে। কিংবা ভূগোলের সেই দুই ভূভাগের সংযোগকারী যোজকের মত। এমন ক'রে আলাপ জমবে। ছবি দেখা শেষ হ'লে দু'জনকে নিয়ে ইন্দু ঢুকবে কোন রেষ্টুরেণ্টে। সেখানে চা খেতে খেতে আর এক দফা আলাপে ওদের সাহায্য করবে ইন্দু। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাসবীকে নিজের বাসায় ক'দিনের জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে আনাবে। তারপর নানাছন্দে বই দেওয়া-নেওয়া উপলক্ষ ক'রে বার বার ওকে পাঠাবে চিন্ময়ের ঘরে। দোরের কাছে নিজে থাকবে আড়ি পেতে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে মামা-মামীকে বলবে, 'দিন-ক্ষণ ঠিক করুন, ছাপতে দিন বিয়ের চিঠি।'

ছাপার অক্ষরে লেখা না হ'লে কি হবে, ইন্দুর এই সত্যি ঘটনামূলক নভেলটি চিন্ময়ের বন্ধুর লেখা ওই 'শাখা-প্রশাখা' খানার চাইতে

নিশ্চয়ই অনেক ভালো ওৎরাবে। শরৎবাবুর কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছবে হয়তো। মনে মনে হাসল ইন্দু।

ভোরের দিকে নিজের পরিকল্পনা ইন্দু স্বামীকে শোনাল।

অনুপম বলল, 'সব তো বুঝলাম, কিন্তু ম্যাও ধরবে কে। সিনেমার টিকিটের খরচটা কে দেবে।'

হঠাৎ যেন ঘা খেল ইন্দু। উড়ন্ত পাখির একটা ডানা কাটা পড়েছে।

যত্র আয়, তত্র ব্যয়। ভারি হিসেব ক'রে চালাতে হয় সংসার। একটা পয়সা যাতে এদিক-ওদিক না হয় তার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। তবু দিনের পর দিন খরচ বাড়ে ছাড়া কমে না। জিনিসপত্রের দাম ক্রমেই আক্রা হয়। যুদ্ধ থামল, দেশ স্বাধীন হোল। কিন্তু সব যেন শুধু খবরের কাগজের খবর। মানুষের অবস্থা তার বদলালো না। তুমি যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে।

কিন্তু তবু নিজের জন্য আলাদাভাবে কি খরচ করে ইন্দু। আগে বছরে ছ'খানা শাড়ি পড়ত, এখন চারখানায় চালায়। অনর্থক ট্রাম-বাসে পয়সা খরচ হবে বলে কোথাও বড় একটা বেরোয় না। কোন জিনিস সখ করে কেনে তাও তো সংসারের জন্যই। তবু তা নিয়ে অনুপম রাগ করে, 'এই জিনিসই বড়বাজার থেকে কিনলে অনেক সস্তায় হোত। কিন্তু নিজে সর্দারী না করলে তো তোমার চলে না।' আসলে সবটুকু সর্দারী যে অনুপমের নিজে না করলে চলে না, সেকথা কে বলবে।

একটু চুপ ক'রে থেকে ইন্দু বলল, 'টিকিটের খরচ তুমি না দাও চিন্ময় দেবে। ওর কাছ থেকেই আদায় করব। ওর জন্যইতো

এত সব হাঙ্গামা। লক্ষ্মী ছেলের মত বিয়েটি করে ফেললে তো আর এসবের দরকার হোত না।'

অনুপম বলল, 'না না সে ভালো দেখায় না। ওর পয়সায় তুমি কেন সিনেমা দেখতে যাবে।'

ইন্দু হেসে বলল, 'ভালো জ্বালা। ওর পয়সায়ও দেখব না—তোমার পয়সায়ও দেখব না, আমি পয়সা পাব কোত্থেকে শুনি? আমি নিজে কি রোজগার করি? না কি রোজগারে না নামা পর্যন্ত সব বন্ধ থাকবে?'

সমস্যার সমাধান ইন্দুই করল। কারো পয়সাই তার নেওয়ার দরকার হবে না। চালের খুদ, আটার ভূষি, পুরোন খবরের কাগজ আর ওষুধের শিশি বোতল বিক্রি ক'রে গোপনে বার্লির কৌটোটায় যা জমে তাকে ইন্দুরই রোজগার বলা যেতে পারে। নানা সাংসারিক কাজে কৌটার সঞ্চয় ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তবু যা আছে তাতে একদিনের সিনেমার খরচটা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। তারপর ওদের বিয়ে হয়ে গেলে মামীমার কাছ থেকে টাকাটা সুদে-আসলে আদায় করে নেবে ইন্দু।

খানিক ভেবে অনুপম মত দিল। তারপরে ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে মেয়েকে হৈমবতীর হেপাজতে রেখে খেয়ে দেয়ে স্বামীর অফিসের সময় ইন্দু তার সঙ্গিনী হোলো। যাওয়ার পথে অনুপম তাকে গড়পারে মামাবাড়ির পথে নামিয়ে রেখে যাবে। প্ল্যানটা মামা মামী আর বাসবীকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেওয়া দরকার। একটু ঘুরতে হবে অবশ্য অনুপমকে। তা হোলই বা। এখনকার দিনে নিজের মানসম্মান কি সহজপথে রাখা যায়।

মামা অফিসে বেরিয়ে গেছেন। বাসবী কলেজে। একপাল ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে মামীমা ব্যতিব্যস্ত। একটির পিঠে সশব্দে

চড় মারছেন, আর একটির পিঠ আস্তে আস্তে চাপড়াচ্ছেন ঘুম পাড়াবার জন্য।

ইন্দুকে দেখে ভারি খুসি হলেন তিনি। 'এই যে আয়। কতকাল আসিসনে। একেবারেই পর হয়ে গেছিস।'

ইন্দু বলল, 'পর করে দিয়েছ, হব না?'

মামীমা বললেন, 'এলি যদি বাচ্চাদের নিয়ে এলিনে কেন। কতকাল ওদের দেখিনে।'

ইন্দু বলল, 'পরে একদিন দেখো, আগে একটা কথা শুনে নাও।'

একটা নয়, অনেক কথাই বলল ইন্দু, ঘরসংসারে অনেক কথাই শুনল। উঠে পড়ল দূর আর নিকট সম্পর্কের অনেক আত্মীয় কুটুম্বের কথা। অভাব অনটন অসুখ বিসুখ সংসারে অশান্তি লেগেই আছে। মামীমার মাসতুতো ভাইয়ের বউয়ের শরীর ভালো নয়।

ইন্দু বলল, 'কেন তার আবার কি হলো?'

মামীমা বললেন, 'কি আবার। এই ন'মাস। তুই শুনিস নি বুঝি। এইতো বছর খানেক আগেও একটি হয়েছে।'

ইন্দু মুখ টিপে একটু হাসল. 'মামীমা, তোমার শরীরটাও খারাপ নাকি?'

মামীমা শাসনের ভঙ্গিতে বললেন, 'ফাজিল কোথাকার।'

তারপর তিনি নিজেও হাসলেন একটু, 'আর বলিস কেন, শত্তুরদের জ্বালায় আর পারিনে। আবার একটা আসছে।'

সন্তানকে 'শত্তুর' অবশ্য সোহাগ করেই বললেন মামীমা। কিন্তু ইন্দু দেখল, মামীমার শরীরের সত্যিই আর কিছু নেই। ভারি পরিশ্রান্তও দেখাচ্ছে তাকে। এই চেহারা, এই স্বাস্থ্য নিয়ে বছর বছর শত্রুদের পাল্লায় পড়লে ক'দিনই বা আর বাঁচবেন মামীমা। ইন্দুর ভারি মায়া হোল ওঁর ওপর। রাগ হোল, সত্যিই শত্রু মনে হোল পেটেরটিকে,

কিন্তু যে আসছে তার দোষ কি। নিজেদের শত্রু তো নিজেরাই। মামীমা অবশ্য একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন—জনবলও বল। এই নিয়ে চিন্ময়ের সঙ্গে একদিন আলোচনা হয়েছিল। সে কথা ইন্দুর মনে পড়ে গেল। চিন্ময় বলেছিল, দায়ী বাপ মা। সাধ্যের অতিরিক্ত হলে সন্তানও বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। মুখে অবশ্য চিন্ময়ের কথা ইন্দু স্বীকার করে নি কিন্তু মামীমার দশা দেখে মনে মনে তার যুক্তি আজ ইন্দু না মেনে পারল না।

সিনেমার কথা তোমায় মামীমা বললেন, 'অবশ্য তুই সঙ্গে থাকলে আমার আর আপত্তি কি, কিন্তু ছেলের যদি তেমন পছন্দ না হয়ে থাকে, জোর জবরদস্তি করে কাজ নেই বাপু।'

ইন্দু অবাক হয়ে বলল, 'ওকথা তুমি আবার কার কাছে শুনলে।'

মামীমা বললেন, 'অনুপমের কথার ধরণে সেই রকমই যেন একটু একটু মনে হলো।'

ইন্দু প্রতিবাদ করে বলল, 'না না, ও তোমাদের ভুল ধারণা। পছন্দ হয়নি কে বলল, পছন্দ ঠিকই হয়েছে। ভয় কেবল বিয়ের নামে। আজকালকার ছেলেদের ধরণই ওই। বিয়ে তো নয়, জলাতঙ্ক। তা চিন্ময়ের আতঙ্ক ঘুচাবার ভার আমি নিচ্ছি তুমি ভেবো না। আমার কথা চিন্ময় ফেলতে পারবে না।'

মামীমা ইন্দুর দিকে তাকালেন, 'কেন চিন্ময় কি তোর খুবই বাধ্য নাকি?'

ইন্দুও তাকাল মামীর দিকে। কথাটা কেমন যেন একটু বেসুরো আর ভঙ্গিটা বিসদৃশ লাগল ইন্দুর। তারপর একটু চুপ করে থেকে মামীমার ইঙ্গিতটা গায়ে না মেখে বেশ জোর আর জেদের সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, বাধ্যই তো। বাধ্য না হলে কি এতখানি সাহস পাই।'

মামী বললেন, 'তোমার বেশি সাহসের দরকার নেই বাপু। যা সয় তাই করো।'

শনিবার। কলেজ থেকে সকাল সকালই ফিরে এল বাসবী। বেণী দুলছে পিঠের ওপর। হাতে বাঁধানো কখানা বই আর খাতা। স্বাস্থ্য তো বেশ ভালো হয়েছে ওর। বেশ দৃপ্ত, আত্মপ্রতিষ্ঠভাব। এ বয়সে অহংকার একটু থাকেই, দেখতে ভালোও লাগে। এ বাড়ির মেয়েদের মধ্যে বাসবীই এই প্রথম ঢুকল কলেজে। একটু অহংকার ওর হবে না কেন। ইন্দুর আর স্কুলের গণ্ডী ডিঙানো হোল না। তার আগেই বিয়ে হয়ে গেল। এতদিন বাদেও পুরোন দুঃখটা মনে পড়ল ইন্দুর। বাসবীকে দেখে হিংসা হোল।

সিনেমার কথায় বাসবী বলল, 'তা বেশতো, সিনেমা যদি কেউ দেখাতে চায় তবে না দেখে কে। কিন্তু বাংলা ছবি টবি নয়, রোমিও-জুলিয়েট হচ্ছে 'ছায়া'তে। দেখান তো ওটা দেখতে পারি, সেবার মেট্রোতে এসে ঘুরে গেল, অঞ্জু মঞ্জুরা দেখে এসেছিল দু'বোন। বড়লোকের মেয়ে। ভালো বই ওদের কোনটাই বাদ যায় না। দেখব দেখব করে আমার আর সেবার দেখা হোল না।'

ইন্দুর পক্ষপাত ছিল বাংলা ছবির উপর। কিন্তু বাসবীর মতেই মত দিতে হোল। ওর জন্যই তো সব। ম্যাটিনি শো'য়ে যেতেও বাসবী রাজী হলোনা। ঠোঁট উল্টিয়ে বলল, 'দূর দূর। দিনের বেলায় আবার কেউ ছবি দেখে নাকি—রাত না হলে কি নাটক জমে?'

ইন্দু ঠোঁট টিপে হাসল, 'তাতো ঠিকই।'

তাই সময়ের ব্যাপারেও ওর সঙ্গে সায় দিল ইন্দু।

অফিস থেকে ফেরার পথে অনুপম স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

জামা কাপড় পরে চিন্ময় তখন বেরুবার উদ্যোগ করছে, ইন্দু ঢুকলো ঘরে, 'শোন একটা কাজ করতে হবে।'

চিন্ময় বলল, 'বলুন। কিন্তু আমাকে তো কোন কাজের মানুষ বলে মনে করেন না আপনি।'

ইন্দু গম্ভীর হয়ে বলল, 'ভারি আফশোস না? কিন্তু আজকে হঠাৎ মনে হোল, তোমার মত কাজের মানুষ আর দুটি নেই। শোন, তিন মণ চাল জোগাড় করে দাও দেখি আমাকে ব্ল্যাক মার্কেট থেকে।'

চিন্ময় বিস্মিত হয়ে বলল, 'বলেন কি, অত চাল দিয়ে কি হবে, এই রেশনের দিনে অত চাল পাবই বা কোথায়?'

ইন্দু হেসে উঠল, 'যারা সত্যি সত্যি কাজের মানুষ তারা জানে কোন্ জিনিস কোথায় পাওয়া যায়। চালের কথায় তারা ঘাবড়ে যায় না। শোন, চাল না, তিনখানা সিনেমার টিকিট। ছায়াতে রোমিও জুলিয়েট হচ্ছে তার টিকিট। হদিশ দিয়ে দিচ্ছি কাউণ্টারের সামনে দাঁড়ালেই পাওয়া যাবে।'

চিন্ময় বলল, 'বাঁচলুম, চালের কথাটা তা হলে চাল?'

ইন্দু বলল, 'এবার আর তোমাকে পায় কে? নিজের রাজ্য ফিরে পেয়েছ। কাজ নয় কেবল কথা। এরপর আধঘণ্টা ধরে অনুপ্রাসে অনুপ্রাসে ত্রাস ধরিয়ে ছাড়বে। শোন, তিনখানা টিকিট কিন্তু আমার আজই চাই।'

চিন্ময় বলল, 'গরজটা খুব বেশি বলে মনে হচ্ছে যেন। তিন জন কে কে?'

ইন্দু মুখ টিপে হাসল, 'অনুমান কর।'

'অনুপমদা তো নিশ্চই যাবেন।'

ইন্দু বলল, 'না গো না অত ভয় নেই তোমার। তিনি যাবেন না। শুধু আমরা দুজন আর সঙ্গে একজন অনুপমাকে ধরে নিয়ে যাব।' ইন্দু মিটি মিটি হাসতে লাগল।

চিন্ময় তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটু কাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমি কেবল একজন অনুপমাকেই জানি।'

সেই দৃষ্টির সামনে হঠাৎ ইন্দুর মুখের হাসি নিভে গেল। ঢিপঢিপ করতে লাগল বুকের মধ্যে। একটু বাদে বলল, 'ওমা, টাকা আনতে তো ভুলে গেছি। ওপর থেকে টাকা নিয়ে আসি দাঁড়াও।'

টাকা নিয়ে নেমে এসে ইন্দু দেখল চিন্ময় ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে।

পর দিন ব্যাপারটা টের পেয়ে তিলু আর মিনু বায়না ধরল তারাও যাবে সিনেমায়। কিন্তু ওদের আর কি করে নিয়ে যাওয়া যায়। তিনখানাতো মাত্র টিকিট। তাছাড়া ওরা ও ছবি বুঝবেই বা কি।

ইন্দু তাদের বলল, 'তোমারা আর এক দিন যেয়ো। ভালো ছবি দেখাবো তোমাদের।'

কিন্তু দুজনেই নাছোড়বান্দা।

ইন্দু তখন স্বামীকে বলল, 'এক কাজ কর, ওদের তুমি আর একটা বাংলা ছবি টবি দেখিয়ে নিয়ে এসো।'

হৈমবতী বললেন, 'কেন ওদের সঙ্গেই নিয়ে যাও না ইন্দু। ওদেরও তো দেখতে ইচ্ছা করে। যাই কর আজ কিন্তু আর আমার কাছে গছিয়ে যেওনা বাপু। মিনুতো কাল কেঁদেই অস্থির।'

অনুপম বলল, 'আচ্ছা আমি ওদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসছি।'

কিন্তু বেশিক্ষণ অনুপম বাইরে রইল না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে ইন্দুদের বেরুবার অনেক আগেই এসে হাজির হোল। আউটরাম ঘাট থেকে তাদের ষ্টীমার দেখিয়ে এনেছে অনুপম, খেলনা কিনে দিয়েছে, মিষ্টি খাইয়েছে দোকানে। কথা দিয়েছে পরের রবিবারে

চিড়িয়াখানা দেখিয়ে আনবে। দুজনেই খুব খুসি। কেবল অনুপমকেই একটু ভার ভার দেখাল।

ইন্দু স্বামীর মনের ভাব বুঝে বলল, 'এক কাজ কর। চিন্ময় আর বাসবীকে নিয়ে তুমিই দেখে এস সিনেমা।'

অনুপম চটে উঠে বলল, 'সিনেমা আমি কোনদিন দেখি নাকি যে দেখব? ওসব ন্যাকামি আমার ভাল লাগে না।'.

সময় বেশি নাই। গড়পারে আবার খানিকটা দেরি হবে। ইন্দু তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিল। চওড়া কালো-পেড়ে শাদা খোলের তাঁতের শাড়ি পরল। হাতে শাঁখার সঙ্গে শুধু দুটি চুড়ি। গলায় সরু হার। কানে স্বর্ণাধারে গাঢ় রক্তবর্ণের লাল ফুল বসানো। কপালের মাঝখানে মাঝারি আকারের সিঁদুরের ফোঁটা। সিঁথি সিঁদুরের রক্তরাগে রঞ্জিত। শাদা ব্লাউজের হাতায় শুধু একটুখানি সরু সবুজের ঘের। আর কোন রঙ নেই। আর রঙ আছে চুলে। গভীর কালো রঙ। সে রঙ জমাট বেঁধে আছে ঘনবদ্ধ কবরীতে।

জানলার শিকের ফাঁকে চিন্ময়ের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় তাড়াতাড়ি মাথার আঁচল তুলে দিল ইন্দু, তারপর দোরের কাছ থেকে বলল, 'কি, হোল তোমার?'

চিন্ময় বলল, 'আমার হতে আর কতক্ষণ লাগবে। গেঞ্জির ওপর একটা পাঞ্জাবি চড়িয়ে নিলেই হয়। আপনার 'হওয়ার' জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। চমৎকার হয়েছে কিন্তু।'

শেষ কথাটা একটু নিচু গলাতেই বলল চিন্ময়।

ইন্দু লজ্জিত ভঙ্গিতে মৃদু হাসল, 'কি যে বল।'

কিন্তু অনুপম কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে দুজনের কেউ লক্ষ্য করেনি।

গম্ভীর গলায় স্ত্রীকে সে ডাকল 'শোন।'

ইন্দু একটু চমকে উঠে মুখ ফিরাল, 'কি বলছ।'

অনুপম বলল, 'তোমার আক্কেলখানা কি। এই বেশে কেউ আত্মীয় কুটুম্বের বাড়িতে যায়। কেন আমি কি ফকির হয়ে গেছি, না তুমি বিধবা হয়েছ। ওপরে চল, শাড়ি বদলে নেবে।'

ইন্দু দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা একটু চেপে ধরে নিজেকে সামলে নিল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'কেন এ শাড়িতে দোষ করল কি। আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়িতে বিয়ে অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ রাখতে তো আর যাচ্ছি না, যাচ্ছি সিনেমায়। যা পরেছি এতেই চলবে।'

অনুপম বলল, 'না চলবে না, আমি বলছি চলবে না। ওপরে চল শিগ্গির।'

বাদ-প্রতিবাদ করে লাভ নেই। চিন্ময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছে। ইন্দু স্বামীর পিছনে নিজের ঘরে এসে ঢুকল।

চাবি নিয়ে অনুপম নিজের হাতে ট্রাঙ্ক খুলল। বেছে বেছে বার করল গোলাপী রঙের জর্জেট। গতবছর পূজোর সময় কিনে দিয়েছিল। স্ত্রীকে বলল, 'এইখানা পর।'

ইন্দু বলল, 'নিজের পছন্দমত শাড়িখানাও পরতে পারব না?'

অনুপম বলল, 'তোমার পছন্দমতই তো আজকাল সব হচ্ছে। আমার পছন্দমতও দু একটা জিনিস হোক না, তাতে ক্ষতি কি।'

কথার জবাব দিতে গেলে ঝগড়া বাধবে। পাশের ঘরে গিয়ে শাড়ি ব্লাউজ বদলে এল ইন্দু।

কিন্তু কেবল শাড়ি বদলেই রেহাই নেই। অনুপম বলল, 'হার আর আর্মলেটটা পরে নাও।'

ইন্দু বলল, 'হার তো পরেই আছি।'

অনুপম বলল, 'না, নেকলেশটাই পর, বেশ মানবে। ওগুলি তো পরবার জন্যই করা হয়েছে, না-কি ?'

একে একে সবই পরে নিল ইন্দু, তারপর বলল, 'এবার হয়েছে তো ?'

অনুপম স্ত্রীকে টেনে এনে আয়নার কাছে দাঁড় করিয়ে দিল, 'নিজেই দেখ হয়েছে কি-না ? আগের চেয়ে ঢের চমৎকার দেখাচ্ছে, তা তুমি স্বীকার কর আর নাই কর।'

ইন্দু একটু হাসল, 'অস্বীকার করবার কি আর জো আছে।'

'জো নেই, তা জানো ?'

বলে হঠাৎ স্ত্রীকে জোর করে বুকে চেপে ধরল অনুপম। তারপর ডানদিকের গালে গভীর চুম্বনের চিহ্ন এঁকে দিল।

একটুকাল স্তব্ধ রুদ্ধশ্বাস হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ইন্দু। আয়নার চেয়ে দেখল গালে রীতিমত দাগ ফুটে উঠেছে। তারপর অনুপমের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ছি ছি, কি করলে বল দেখি, আমি এবার বাইরে বেরোই কি করে। আমি আর যাব না, তুমি চিন্ময়কে না করে দাও।'

অনুপম অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল, 'তাই কি হয়, বেচারা কত সখ করে টিকেট কেটে এনেছে, যাও ঘুরে এসো গিয়ে। তা ছাড়া বাসবীও তো বসে থাকবে।'

যাওয়ার জন্য অনুপম এবার বারবার তাড়া লাগাতে লাগল।

ইন্দু আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে স্নো-পাউডারের প্রলেপে গালের দাগ ঢাকতে চেষ্টা করল। মাথার ঘোমটাটা আর একটু টেনে দিল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত পায়ে নেমে গেল নিচে। অনুপম নিজে ওদের ট্রাম লাইন পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল। চিন্ময়ের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসল অনুপম। ঠিক হয়েছে, এবার ঠিক হয়েছে। চিন্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনুপমের স্ত্রীই যে যাচ্ছে এখন

আর তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। অনুপমের আর সঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই। তার রুচি ইন্দুর সর্বাঙ্গ ঘিরে রেখে তাকে আগলে নিয়ে চলেছে। তা ছাড়া অনুপমের সালঙ্কারা স্ত্রী রাজেন্দ্রাণী ইন্দুর কাছে চিন্ময়কে কেউ গোমস্তা কি বাজার-সরকারের বেশি ভাবতে পারবে না।

ট্রামে পাশাপাশিই বসল দুজনে। অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর চিন্ময় বলল, 'বেশটা জমকালো করেই এলেন শেষ পর্যন্ত।'

ইন্দু বলল, 'এলামই বা। ওপরের বেশটাই কি সব?'

চিন্ময় আর কিছু বলল না।

দোরের কাছে বাসবী দাঁড়িয়ে ছিল। চিন্ময় আর ইন্দুকে আসতে দেখে তাড়া তাড়ি ভিতরে সরে গেল। চিন্ময়কে বাইরের ঘরে মামার কাছে বসিয়ে রেখে ইন্দু বাসবীর পিছনে পিছনে এসে বলল, 'ব্যাপার কি, এখনো তৈরী হয়ে নিসনি যে।'

বাসবী বলল, 'আমি তো ভাবলাম, আপনারা আজ আর আসবেনই না। এখানে এসে চা খাবেন তাইতো কথা ছিল।'

ইন্দু বলল, 'চা একবার বাড়ি থেকেই খেয়ে এসেছি। আর একবার বাইরে গিয়ে খাব। তুই তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নে। আর দেরি করিসনে।'

বাসবী একটু হাসল, 'তোমরা যত খুসি দেরি করতে পার, কেবল আমি দেরি করলেই দোষ।'

তক্তপোষের ওপর দু'তিনখানা শাড়ি ছড়ানো। একখানা কম দামী তাঁতের, আর একখানা নকসী পাড় কিন্তু শাদা খোলের মিলের শাড়ি। তৃতীয়খানা পুরোন জর্জেট। একটা জায়গায় একটু দাগ ধরেছে।

ইন্দু বলল, 'কি টুলু বুঝি শাড়ি সম্বন্ধে মনস্থির করতে পারছে না।'

মামীমা বললেন, 'আর বলনা মা। ওর যে কোন একখানাই তো পরে বেরোন চলে। সিনেমা দেখতেই তো যাচ্ছিস, আর কোথাও তো যাচ্ছিস নে। কিন্তু মেয়ের মনই ওঠে না। ভালো শাড়িখানা পরশুদিন লণ্ড্রীতে আর্জেন্ট ধুতে দিয়েছিল। বৃষ্টির জন্য আসেনি। উনি বলেছেন সামনের মাসে আবার একখানা এনে দেবেন। একটা লোকের উপর অত চাপ দিলে কি আর চলে ইন্দু। মুখ তো আর একটি দুটি নয়। সবাইকে দানাপানি জুগিয়ে তবে তো বাবুগিরি বিলাসিতা।'

বাসবী বলে উঠল, 'কে করতে চাইছে বিলাসিতা। বাবুগিরির খোঁটা দিচ্ছ! বাবুগিরির মধ্যে তো হেঁটে কলেজে যাই, আর হেঁটে আসি। সব বই কিনতে পারিনে, পরের বই ধার করে এনে পড়ি, পড়া টুকে নিই। এমন বাবুগিরির পড়া ছেড়ে দিয়ে কালই আমি চাকরি খুঁজব। তুমি ভেবনা, আমার জন্য আর কোন খরচ হবে না তোমাদের।'

ইন্দু বলল, 'ছিঃ, অমন করে বলে নাকি মাকে। কি লেখাপড়া শিখছিস তোরা কলেজে।'

বাসবী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'চুপ করুন ইন্দুদি। কলেজে লেখাপড়া না শিখেও আপনি অনেক কিছু শিখেছেন তা দেখতে পাচ্ছি।'

ইন্দু মামীমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'আপনি একটু বাইরে যান মামীমা, আমি ওকে শান্ত করে নিয়ে যাচ্ছি।'

ছোট ছেলে-মেয়েরা দোরের কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। মামীমা তাদের তাড়া দিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

দেয়ালে বড় একখানা আয়না ঝুলানো। হঠাৎ তার দিকে চোখ পড়ায় বাসবীর ক্ষোভের কারণ এতক্ষণে যেন বুঝতে পারল ইন্দু। সত্যি, নিজের এই চটকদারী বেশবাসের কথা এতক্ষণ তার মনেই ছিল

না। এ লজ্জা তো তার নিজের নয়, আর একজনের। কি করে খেয়াল থাকবে। একটু চুপ করে থেকে ইন্দু বলল, 'তোর জামাইবাবুর যত সব কাণ্ড। জানিসই তো সাজ-সজ্জার ঘটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে। তবু তিনি জোর করে—।আমি কেবল কেলেঙ্কারীর ভয়ে—। তা এক কাজ কর। আমার এই শাড়ি আর হার তুই পর, এইমাত্র পাট ভেঙে পরে এসেছি। তোর ওই শাদা খোলের মিলের শাড়িখানা আমাকে দে, ওতেই হয়ে যাবে আমার।'

মাথার আঁচল পড়ে গিয়েছিল ইন্দুর। বাসবী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছিল। ইন্দুর কথার জবাবে সে অল্প একটু হাসল, 'থাক ইন্দুদি, থাক। আর ভদ্রতা করে কাজ নেই আপনার। খুব হয়েছে।'

বাসবী এবার যেন বুঝতে পারছে তাকে সেদিন দেখতে এসে চিন্ময় কেন অত উদাসীন হয়ে রয়েছিল। অবজ্ঞা দিয়ে কেন অমন করে অপমান করছিল তাকে।

ইন্দু বলল, 'কেন তুই অমন করছিস টুলু, হয়েছে কি? তুই আমার বোন না? আমার শাড়ি গয়না পরলে তোর অপমান হয়?'

বাসবী বলল, 'মান-অপমানের কথা নয় ইন্দুদি, প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তির কথা। আমরা গরীব হতে পারি, কিন্তু অন্যের ব্যবহার করা কোন জিনিস নিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। সাত জন্ম শাড়ি গয়না না পরলেও নয়, সাত জন্ম বিয়ে না হলেও নয়, ইন্দুদি।'

বাসবী ফের একটু হাসল। আর সে হাসি দেখে শিউরে উঠল ইন্দু। এ হাসি সে আরো একজনের মুখে দেখেছে।

ইন্দু বলল, 'কি, কি বললি!' সঙ্গে সঙ্গে আয়নায় ডানদিকের গালে রক্তাভ চিহ্নটি চোখে পড়ল ইন্দুর।

বাসবী বলল, 'কিচ্ছু বলিনি ইন্দুদি। আমার খুব মাথা ধরেছে আপনারা যান, দেখে আসুন গিয়ে সিনেমা। আমি আজ আর যাব না' বলে বাসবী তক্তপোষের ওপর বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল।

ইন্দু মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। বাসবীকে কিছু বলতে পর্যন্ত তার প্রবৃত্তি হোল না।

মামীমা জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই শুনেছিলেন। তিনি এবার বললেন, 'ওকে আর সাধাসাধি করে লাভ নেই ইন্দু। বড় একগুঁয়ে মেয়ে। একবার যখন না বলেছে, তখন আর হাঁ করবে এমন কারো সাধ্য নেই। তোমরাই যাও। ও না যেতে চায় না গেল।'

ইন্দু বলল, 'আচ্ছা।'

বাইরের ঘরে এসে ঢুকতেই মামা বললেন, 'কি-রে টুলু এল না?'

ইন্দু মাথা নেড়ে বলল, 'না সোনা মামা, ওর নাকি মাথা ধরেছে। চল চিন্ময়।'

মামা বললে, 'সে কি, এক ভদ্রলোককে নিয়ে এলি চা-টা কিছু খেলিনে।'

ইন্দু একটু ম্লান হাসল, 'চা আর একদিন এসে খাব সোনা মামা। আজ আর সময় নেই।'

বাইরে এসে খানিকটা পথ এগিয়ে ইন্দু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, হিংসা দ্বেষটা কাদের বেশি পুরুষদের না মেয়েদের?'

চিন্ময় বলল, 'এ কথা বলছেন যে।'

ইন্দু বলল, 'ইচ্ছা হোল তাই বললাম। আমার কথার জবাব দাও।'

চিন্ময় একটু হাসল, 'আমার জবাবটা আপনাদের অনুকূলে হবে না। মেয়েদের হিংসা অনেক গুণে বেশি। সেই তুলনায় পুরুষরা রীতিমত অহিংস পরমহংস।'

ইন্দু একটু চুপ করে থেকে বলল, 'দেখ, সিনেমা দেখতে আর ইচ্ছা করছে না। কেন যেন ভারি খারাপ লাগছে অথচ অতগুলি টাকা দিয়ে কেনা টিকিট—'

চিন্ময় বলল, 'তাতে আর কি হয়েছে। সিনেমা হাউসটা খুব বেশি দূরে নয় এখান থেকে। যাওয়ার পথে হয়ে যাব। কেউ টিকিটগুলি নেয় তো নিল। না নেয়, কটা টাকা লোকসানই যাবে না হয়। আপনার লোকসানের চেয়ে তো আর তার পরিমাণ বেশি নয়।'

ইন্দু চমকে উঠল, 'আমার আবার কি লোকসান হতে যাবে।'

চিন্ময় বলল, 'না হলেই ভালো। একটা রিকসা নিই না ট্রামে যাবেন?'

ইন্দু বলল, 'না না হেঁটেই চল, বেশ লাগছে হাঁটতে। ছবি দেখবার তো আর গরজ নেই আমাদের। তার চেয়ে শহর দেখতে দেখতে যাই। অনেকদিন এমন করে হাঁটি না রাস্তায়। বেশ লাগে হাঁটতে।'

দেরি হয়ে গেলে টিকিটগুলি আর বিক্রি হবে না সে কথাটা আর বলল না চিন্ময়।

হাঁটতে ভালই লাগছিল। রোদ নেই। গাঢ় কালো নয়না-ভিরাম মেঘে আকাশ ঢেকেছে। তুপুরে খুব গরম পড়েছিল। এবার খুব ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। সে হাওয়ায় কেবল দেহ নয় ইন্দুর, মনটাও জুড়িয়ে গেল।

অনেক দিন—অনেকদিন যেন এমন খোলা আকাশের নিচে শহরের মাঝখানে দাঁড়ায়নি ইন্দু। শহর মানে ছিল চার দেয়াল ঘেরা

ঘর, ঘরের বাইরে যে পৃথিবীর আরো অস্তিত্ব আছে তা যেন এতদিন মনেই পড়েনি। আজ পড়ল। মনে পড়ল, চোখে পড়ল। এই মেঘ আর মেঘবতী নগরী দেখে ইন্দুর মনে রইল না আজ কি উদ্দেশ্যে সে বেরিয়েছিল, সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কি হয়নি, কে তাকে অপমান করেছে কি করেনি।

যেতে যেতে ইন্দু বলল, 'ছেলেবেলায়—ঠিক ছেলেবেলায় নয় তের-চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত—কলকাতার রাস্তায় এমন অনেক বেড়াতাম। মাঝে মাঝে গাড়িতে, মাঝে মাঝে হেঁটে। সার্কাস দেখেছি আর সিনেমা। বাবা ভারি ঘুরতে ভালোবাসতেন আমাকে নিয়ে। মা মারা যাওয়ার পর থেকে আমিই ছিলাম তাঁর একমাত্র সঙ্গী। কোন সুখ-দুঃখের কথাই তিনি আমার কাছে গোপন করতেন না। ঠিক বন্ধুর মত। তেমন আর পেলাম না।'

চিন্ময় বলল, 'বন্ধুর মত আর কাউকেই পাননি তারপর?'

ইন্দু চিন্ময়ের দিকে তাকাল, তারপর একটু হেসে বলল, 'তুমি কি অন্য জবাব আশা করছিলে? কিন্তু বন্ধু কি অত ঘন ঘন পাওয়া যায়, না-কি বন্ধু হওয়াই খুব সহজ?'

একটু বাদে দুজনে সিনেমা হাউসের সামনে এসে দাঁড়াল। একখানা টিকিট প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে গেল। আর দুখানার ক্রেতা মিলল না।

চিন্ময় বলল, 'চলুন ফিরি।'

ইন্দু বলল, 'আর টিকিট দুটো।'

চিন্ময় বলল, 'ও দুটো অক্ষত আর অক্ষয় হয়ে থাকবে আমার স্যুটকেসে। দেখুন টাকা দিয়ে আর যে কোন জিনিসই কিনি অক্ষত ভাবে ঘরে নিয়ে যাওয়া যায়। শুধু সিনেমার টিকেটের বেলায় এই ব্যতিক্রম। পুরো টাকা দিয়ে ছেঁড়া টিকেট পকেটে বয়ে নিয়ে যেতে

হয়। আমরা আজ আস্ত টিকেট নিয়েই ফিরে যেতে পারব, এটা কম ভাগ্যের কথা নয়।'

ইন্দু হেসে বলল, 'থাক, আর ভাগ্য নিয়ে হায় আফশোস করতে হবে না, তার চেয়ে চল ভিতরেই যাই। ছবি দেখি। বই বোধ হয় এতক্ষণে আরম্ভ হয়ে গেছে।'

কাউণ্টারের ভদ্রলোক বললেন, 'না না, আসল বই আরম্ভ হতে দেরি আছে এখনো, সবে news reel চলছে। যান না, ভিতরে গিয়ে বসুন না আপনারা।'

ঘণ্টা দুই বাদে দুজনে বেরিয়ে এল। অশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। সন্ধ্যার শো'তে যারা এসেছিল তারা অনেকেই দোরের সামনে এসে ভিড় করে রয়েছে। ট্রাম বাস সব বন্ধ। কেবল দু একটা ঘোড়ার গাড়ি আছে, আর ট্যাক্সি।

চিন্ময় বলল, 'একটা ট্যাক্সিই ডাকি।

ইন্দু বলল, 'না না, অত খরচ করে কি হবে, তার চেয়ে বরং বৃষ্টিটা থামুক।'

চিন্ময় বলল, 'তা হলে চলুন, একটু চা খেয়ে নিই।'

ইন্দু একটু ইতস্তত করে বলল, 'চল।'

কাটা দরজা ঠেলে ছোট কেবিনে গিয়ে বসল দুজনে। এতক্ষণ পাশাপাশি ছিল। এবার মুখোমুখি।

চায়ের কাপের মধ্যে চামচ নাড়তে নাড়তে ইন্দু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা তুমি এতে বিশ্বাস কর?'

চিন্ময় বলল, 'কিসে?'

'এই প্রেমে? একজন আর একজনকে কি এমন ভালোবাসতে পারে যে তার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দেয়?'

চিন্ময় বলল, 'করি ?'

ইন্দু একটু হাসল, 'কর ? আশ্চর্য !'

চিন্ময় জিজ্ঞাসা করল, 'হাসছেন যে ?'

ইন্দু বলল, 'হাসছি এই ভেবে যে প্রেমের ওপর এত বিশ্বাস তোমার এল কোত্থেকে। সংসারের অনেক জিনিসই তো তুমি বিশ্বাস করন। অনেক ব্যাপারেই তো তোমার আস্থা নেই।'

চিন্ময় কথাটির সোজা জবাব না দিয়ে বলল, 'দেখুন আমি যে কী, আর কী না, তা আপনি যত সহজে বলতে পারেন, আমি তত সহজে বুঝতে পারিনে। যখন কোন একটি মেয়ের ভালোবাসায় আমি গভীর ভাবে বিশ্বাস করি, তখন সেই বিশ্বাসের অতলতায় আমার সব সংশয় তলিয়ে যায়। তখন এক হিসাবে আমি পরম আস্তিক। যখন তুমি আমি আছি তখন সব আছে।'

ইন্দুর গা শির শির ক'রে উঠল। কিন্তু কৌতুকের হাসিতে চিন্ময়ের ভাবাবেগ উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বলল, 'যাক। আস্তিক কথাটার একটা নূতন মানে শেখা গেল তোমার কাছে। তারপর যখন দেখলে যাকে তুমি ভালবাসো, সে তোমাকে মোটেই ভালোবাসে না, তখন বুঝি মনের দুঃখে ব্যর্থ প্রেমে ফের নাস্তিক হয়ে পড়বে ?'

চিন্ময় ইন্দুর দিকে একটু কাল তাকিয়ে থেকে দেখল, তারপর বলল, 'তা না-ও হ'তে পারি। প্রেম ব্যর্থ হ'লেই তো আর প্রেমের অনুভূতি ব্যর্থ হয় না। প্রেম ব্যর্থ হ'লেই তো আর প্রেমের গল্প ব্যর্থ হয় না।'

ইন্দু এ-কথার কোন জবাব দিল না। হয়তো কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'থাক এখন ওসব। তোমার কাপে আর একটু চিনি দেব ?'

চিন্ময় ঘাড় নেড়ে বলল, 'দিন। কিন্তু আপনি বোধহয় জিজ্ঞাসা করতে চাইছিলেন রোমিও জুলিয়েট আজকালকার দিনে সত্যি কিনা। বাস্তব জীবনে ওদের আজকাল পাওয়া যায় কি না। কেবল আজকাল নয়, ওরা চিরকালই দুর্লভ। অমন সর্বাত্মক প্রেমের স্বাদ আমাদের জীবনে খুব কমই মেলে। তবু যেটুকু পাই তাতেই বুঝি ওরা আছে। যতটুকু পাই, আর যতখানি না পাওয়ার দুঃখ পাই, সব কিছু মিলিয়ে টের পাই ওরা আছে আর ওদের মধ্যে আমরা আছি।'

আমরা! ছি-ছি-ছি। কাদের কথা বলছে চিন্ময়। নিশ্চয়ই তাদের কথা নয়। ওর কাণ্ডজ্ঞান কি অমন লোপ পেতে পারে!

তবু ফের এক ধরণের রোমাঞ্চ অনুভব করল ইন্দু। ভাবল চিন্ময়কে বাধা দেয়। এসব কথা চিন্ময় কেন তার কাছে বলছে। সে এসব শুনে কি করবে। তা ছাড়া ইন্দুর এসব শোনাই কি উচিত? কিন্তু ওকে বাধা দিতেও যেন ইন্দুর লজ্জা করতে লাগল। তার চেয়ে নির্বাক থেকে নিজের অস্তিত্ব গোপন রাখা ভালো, ও নিজের মনে যা বলছে বলে যাক। ওর কোন কথা কানে না তুললেই হোল। কিন্তু আশ্চর্য কানে না তুলেও পারা যায় না। সব কানে যায়।

চিন্ময়কে অবশ্য বাধা দিতে হোল না। সে আপনিই হঠাৎ থেমে গেল। চা শেষ করে চুপচাপ বসে রইল--চেয়ে রইল।

ইন্দুর মনে হোল এর চেয়ে ও যে এতক্ষণ কথা বলছিল তাই যেন ভাল ছিল।

খানিক পরে ইন্দু বলল, 'চল এবার উঠি। বৃষ্টি এতক্ষণে থামল বুঝি। তিলু আর মিনু বোধ হয় না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।'

চিন্ময় হঠাৎ ভারি বিদ্বেষ বোধ করল। তিলু আর মিনু। কে তারা! কিন্তু পরক্ষণেই লজ্জিত হোল।

এবার একটি দুটি বাস চলাচল করছে। তাতে অত্যন্ত ভিড়। শেষ পর্যন্ত ট্যাক্সিতেই ফিরতে হোল।

দোরের সামনেই দেখা হোল অনুপমের সঙ্গে। সে আজ আর ঘুমায়নি। সদরে পায়চারি করছে।

হঠাৎ এই বিনিদ্র অস্থির আর একটি পুরুষের দিকে তাকিয়ে চিন্ময় থমকে গেল। শুধু ভয়ে নয়, লজ্জায়। ইন্দুর স্বামী অনুপম বলে যে কেউ একজন আছে এতক্ষণ তা যেন চিন্ময়ের খেয়ালই ছিল না। অনুপমের উদ্বেগ, তার দুশ্চিন্তা, তার ঈর্ষা, চিন্ময় নিজের ভিতরে অনুভব করল, করবার চেষ্টা করল। এতক্ষণ ইন্দু যেন তার কাছে ছিল, 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ—।' কিন্তু তা তো নয়। ইন্দু সবই, ইন্দুর সব আছে। সব ইন্দুকে ফিরিয়ে দিতে হয়েছে, সকলের কাছে ওকে ফিরিয়ে আনতে হয়েছে। কিন্তু চিন্ময় কেন ফিরে আসতে পারছে না। তার একি দুর্বলতা, আত্মপরতা। ওকে যদি ভালোবাসতে হয়, ওর সব ভালোবাসতে হবে। কিন্তু তা শক্ত, বড় শক্ত।

অনুপম বলল, 'কি হে সিনেমা দেখা হোল তোমাদের ?'

চিন্ময় বলল, 'হ্যাঁ।' তারপর একটু কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলল, 'বৃষ্টির জন্য এতক্ষণ আটকা পড়ে গেলাম।'

অনুপম বলল 'বৃষ্টি তো অনেক্ষণ থেমেছে।'

আর কিছু না বলে চিন্ময় সোজা তার ঘরে চলে গেল।

অনুপম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে একটু কাল তাকিয়ে থেকে স্ত্রীর দিকে ফিরে চেয়ে বলল, 'চল। না কি, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রাতটা কাটিয়ে দেবে। বাকি রাতটুকু বাইরে কাটিয়ে এলেও তো হোত।'

ইন্দু বলল, 'কি যে বল। এই তো সবে সাড়ে দশটা। আর কী বৃষ্টি এতক্ষণ!'

রাত্রে স্ত্রীর পাশে শুয়ে অনুপম জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর চিন্ময় আর টুলুর কি রকম আলাপ টালাপ হোল? বিয়ে করতে রাজী হোল চিন্ময়?'

ইন্দু বলল, 'টুলু গেলই না।'

অনুপম বলল, 'গেলই না মানে!'

ইন্দু তখন সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলল স্বামীকে, তার শাড়ি গয়না দেখে বাসবীর হিংসার কথা অনেকখানি করে বলল কিন্তু আর এক হিংসার কথা একটুও উল্লেখ করল না।

অনুপম বলল, 'ও তাহলে শুধু তোমরা দুজনেই গিয়েছিলে সিনেমায়। গোড়া থেকেই আমার যেন সেই রকম একটা ধারণা হচ্ছিল। তাহলে যা ভেবেছিলাম তাই। বাসবী-টাসবী সব বাজে।'

ইন্দু বলল, 'কি যা তা বলছ। টুলু যদি না যায় আমি কি করতে পারি।'

অনুপম বলল, 'টুলু যে কেন যায়নি, এবার তা বুঝতে পারছি।'

ইন্দু এবার এগিয়ে এসে স্বামীকে জড়িয়ে ধরল, 'শোন, তুমি অমন করে ব'লনা। তোমার ভাবভঙ্গি দেখে আমার ভয় হচ্ছে।'

স্ত্রীর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল অনুপম, বলল, 'থাক থাক তোমার আবার ভয়! ঘৃণা লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়। ঠানদি বলতেন কথাটা। তুমি ও তিনটেই ছাড়িয়ে গেছ।'

পাশের ঘরে মিনু চেঁচিয়ে উঠল। ইন্দু উঠে গিয়ে মেয়েকে কোলে করে নিয়ে এসে দুজনের মাঝখানে তাকে শুইয়ে দিল।

দু'তিন দিনের মধ্যে ইন্দু আর চিন্ময়ের ঘরের দিকে গেল না। চোখে চোখে পড়লেও কথা বলল না তার সঙ্গে। নিজের কাজকর্ম

নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল। কিন্তু তবু অনুপম পায় উঠতে বসতে প্রত্যেক কথায় চিন্ময়ের ইঙ্গিত দিতে লাগল। একবার বলল, 'কি আবার কবে যাওয়া হচ্ছে সিনেমায়। এবার যেদিন যাবে সেদিন বোধ হয় আর কাক-পক্ষী জানতে পারবে না।'

ইন্দু বলল, 'আচ্ছা তুমি কি শুরু করেছ বলতো। জানো এরোগে মানুষ পাগল পর্যন্ত হয়ে যায়।'

অনুপম স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটু হাসল, 'হ্যাঁ, তাইতো এখন বাকি। আমাকে পাগল বলে রটিয়ে দিয়ে যদি একবার গারদে পাঠাতে পার তাহলে আর কোন অসুবিধে থাকে না। নিচের মানুষকে একেবারে অনায়াসে ওপরে তুলে নিতে পার।'

ইন্দু বলল, 'ছি-ছি তোমার সঙ্গে কথা বলতেও আমার ঘৃণা হয়।'

অনুপম বলল, 'তা তো এখন হবেই।'

ইন্দু ভেবে পেল না কেন এই রোগ অনুপমের মাথার ভিতরে ঢুকেছে। এ ধরণের সন্দেহপ্রবণতা তো তার কোন দিনই ছিল না। প্রথম যৌবনে নিজের বন্ধুবান্ধব দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে অনুপম নিজে যেচে তার আলাপ করিয়ে দিয়েছে। তাদের সঙ্গে ভালো করে আলাপ না করলে ঠাট্টা তামাসায় যোগ না দিলে অনুপম রাগ করেছে। আর আজ তিরিশ বছর বয়স হয়ে গেছে ইন্দুর, দু'দুটি সন্তানের সে মা হয়েছে, এখন কি না এই বিশ্রী সন্দেহ। অনুপমের পছন্দমত লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না করে আলাপ আলোচনার মানুষ ইন্দু নিজে বেছে নিয়েছে বলেই কি তার এই আপত্তি। অতি দুঃখে হাসি পেল ইন্দুর। সব থাকতে ওরকম প্রবৃত্তি কেন তার হতে যাবে। বয়স হয়েছে, সংসারের রীতিনীতি ভালোমন্দ সে জেনেছে, মেনেছে, তবু অনুপম তাকে বিশ্বাস করতে পারে না? একজন অল্পবয়সী ছেলের সঙ্গে দুটো হেসে কথা বললে, কি একা একা

একদিন তার সঙ্গে সিনেমা দেখে এলে এতদিনের দাম্পত্য জীবনে অমনি ফাটল ধরবে! বিশ্বাস ভাঙবার দায় পড়বে তার ওপর!

সেদিন থালায় করে মাছ ভেজে রেখেছে। একটু অসাবধান হওয়ায় একখানা মাছ নিয়ে গেছে বিড়ালে। একখানা মাছ কম পড়ল ভাগে। খেতে বসে অনুপম ছেলে মেয়েদের ঠাট্টা করে বলেছিল, 'বিড়াল নয়রে, তোদের মা-ই চুরি করে খেয়েছে মাছখানা। এখন লজ্জায় বলতে পারছে না, বিড়ালের নাম দিচ্ছে।'

মিনু কিন্তু বিশ্বাস করেছিল কথাটা, বলেছিল, 'তুমি চুরি করে মাছ খেয়েছ মা। তুমি আর পাবে না।'

অনুপম হেসে উঠেছিল, 'নাও হোল তো?'

আজও কি অনুপম সেই সরল প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠতে পারে না? বুঝতে পারে না নিজের হেঁসেল থেকে মাছ চুরি করে খাওয়ার মত নিজের এই স্বামীসন্তানের সংসারে চুরি করে আর কাউকে ভালো বাসতে যাওয়াও তার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। বাইরের একটা বিড়াল কোন ফাঁকে যদি হেঁসেলে ঢুকেই থাকে তাকে তাড়িয়ে দিলেই তো হয়। কিন্তু বিড়াল তাড়াবার ভার অনুপম না নিক, ইন্দু নিজেই নেবে। সে নিজেই আজ বলবে গিয়ে চিন্ময়কে, 'তুমি চলে যাও। কলকাতার শহরে আরো অনেক ভাড়াটে বাড়ি আছে, তারই একটা খুঁজে পেতে জোগাড় করে নাও তুমি। এখানে আর নয়।'

মনঃস্থির করে কয়েকদিন বাদে দুপুরের পর ইন্দু আজ আবার ফের চিন্ময়ের ঘরের দিকে গেল। পাশের ঘরে আজও হৈমবতী ঘুমিয়ে রয়েছেন। ইন্দু পা টিপে টিপে দোর ঠেলে ভিতরে ঢুকল। কিন্তু অবাক কাণ্ড। চিন্ময় তো ঘরে নেই। এসময়ে সাধারণত সে ঘরেই থাকে। আজ গেল কোথায়, ঘর ঠিক আগের মতই এলোমেলো

হয়ে রয়েছে। এখানে কতকগুলি বই, ওখানে একরাশ পুরোন কাগজ। স্যুটকেসের ডালাটা খোলা। তার পাশে অর্ধেক-খাওয়া চায়ের কাপের মধ্যে সিগারেটের ছাই ভাসছে। দেখ দেখি দামী কলমটি পর্যন্ত বাইরে রেখে গেছে! ছেলেপুলের বাড়ি। এমন অসাবধানে কেউ কোন দামী জিনিস রাখে। কলমের নিচে এক সীট লেখা কাগজ। ইন্দুর বুকের ভিতরটা হঠাৎ ছাঁৎ ক'রে উঠল। মনে পড়ল তার দূর সম্পর্কের এক খুড়তুতো ভাই পরীক্ষা ফেল করে এমনি ভাবে চিঠির টুকরো রেখে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। আর কিছুতেই তার খোঁজ মেলেনি। এও কি তাই নাকি। বলা যায় না, চিন্ময়ের অসাধ্য কোন কাজ নেই। ইন্দু তাড়াতাড়ি লেখা কাগজখানা হাতে তুলে নিল, তারপর মৃদু হেসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। না, সে ধরণের নিরুদ্দেশ যাত্রার কোন চিঠি নয়। অনেক আঁকি-জুকি অনেক কাটাকুটির পর হতাশ প্রেমিক এক টুকরো কবিতা লিখতে পেরেছেন। ইন্দু স্মিতমুখে পড়তে লাগল।

আমার কথার রঙ
কামনার রঙ যদি ঝরে
তার দুটি পাণ্ডু শীর্ণ কপোলে অধরে
তবু কি হবে না রাঙা তার।
এড়াবেনা বিধি বাধা, নিষেধ পাহারা।
আমার কথার রঙ,
কামনার রঙ যদি ঝরে
পৃথিবীর ফুলে ঘাসে, শিখরে কন্দরে
তবু কি হবেনা রাঙা তারা—
তার মন, তার মুখ, মুখের কথারা।

কিন্তু ফের পড়তে গিয়ে ইন্দুর মুখের হাসি নিভে গেল। ঢিপ ঢিপ করতে লাগল বুকের মধ্যে। ছি-ছি-ছি। এসব কি লিখেছে চিন্ময়! কেন লিখেছে! টুকরো টুকরো করে কবিতাটিকে ছিঁড়ে ফেলল ইন্দু। ছিঃ! মেঝের ওপর ছড়িয়ে দিল টুকরোগুলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ ইন্দু থেমে দাঁড়াল। এই বা সে কি করল। পরের জিনিস নষ্ট করতে গেল ইন্দু কোন্ অধিকারে? এ কবিতা যে তার জন্যই লিখেছে চিন্ময়, তার প্রমাণ কি। হয়তো আর কারো জন্য, হয়তো কোন কাগজের জন্য লিখে থাকবে। ইন্দু কেন তা নষ্ট করে ফেলল। কারো জিনিস নষ্ট করা মানেই তাকে স্বীকার করা, তার কাছে ঋণী হওয়া। ইন্দু আর কারো কাছে ঋণী হতে চায় না।

মেঝের ওপর উপুড় হয়ে বসে টুকরোগুলি এক জায়গায় জড়ো করল ইন্দু, অনেক কষ্টে মিলালো। নিচে এক সীট সাদা কাগজ ছিল। সুন্দর ছোট ছোট অক্ষরে কবিতাটি চিন্ময়ের কলম দিয়েই তাতে টুকে রাখল ইন্দ। তারপর ঠিক আগের মতই তার ওপর কলমটি চাপা দিয়ে রাখল।

ছেঁড়া টুকরোগুলি এখন কি করা যায়? ফেলে দেবে জানালা দিয়ে? হয়ত কেউ দেখে ফেলতে পারে। পথ থেকে কেউ কুড়িয়ে পড়তে পারে। একটু সাবধান হওয়া ভাল। তার যা কপাল। কবিতার টুকরোগুলি নিজের আঁচলেই গিট দিয়ে নিল ইন্দু। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু আশ্চর্য, মনের মধ্যে গুণ গুণ করছে একটি লাইন। আমার কথার রঙ, কামনার রঙ যদি ঝরে। কেবল একটি না, তার পরের লাইনগুলিও একটির পর একটি করে আসছে। কী আপদ! বোধহয় সমস্ত কবিতাটা ইন্দুকে ফের লিখতে হয়েছে বলেই এমন হচ্ছে। ছেলেবেলায় পণ্ডিতমশাই বলতেন—একবার লেখা পাঁচবার পড়ার সমান। লিখলে অনেক বেশি মনে থাকে। সিঁড়ি

বেয়ে ওপরে উঠে এল ইন্দু। ভারি অদ্ভুত দেখতে ছিলেন পণ্ডিত মশাই, মাথা ভরা টাক। মুখখানা যেমন গোল তেমনি বড়। প্রকাণ্ড ভুঁড়িটি আগে আগে চলত। কতদিন যে পিছনের বেঞ্চে বসে ওঁকে দেখে মুখে আঁচল চেপে হেসেচে ইন্দু তার আর ঠিক নেই। সে কথা মনে পড়ায় ইন্দুর আজও হাসি পেল।

অফিস থেকে ফিরে এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে জামার বোতাম খুলছিল অনুপম। স্ত্রীকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপার কি এত হাসি কিসের ?'

'ইচ্ছা হোল হাসলাম। তোমার সংসারে লোকের হাসতে মানা নাকি ?'

অনুপম স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হুঁ, কত মানাই তুমি মানো! কোত্থেকে আসা হোল ? নিচের ঘরে গিয়েছিলে বুঝি ? চিন্ময়কে তো দেখলাম মোড়ের চায়ের দোকানটায় বসে চা খাচ্ছে। তবু ঘরখানা দেখে এলে বুঝি ? ওর খালি ঘর থেকে একটু ঘুরে এলেও শান্তি, তাই না ?'

ইন্দু বলল, 'তোমার মুখে কি আজকাল আর ওসব ছাড়া কোন কথা নেই ?' বলে রাগ করে স্বামীর দিকে পিছন ফিরে তাকের উপর থেকে চিনির কৌটোটা নামাতে গেল ইন্দু।

অনুপম বলল, 'বাঃ বাঃ, বেশ বড় একটা পুঁটলি বেঁধেছ তো, আঁচলে কি প্রেজেণ্ট পেলে, দেখি দেখি আংটি না হার ?'

এগিয়ে এসে অনুপম স্ত্রীর আঁচল চেপে ধরল।

আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে মুখ ফিরাল ইন্দু। সে মুখে রক্ত নেই। কে যেন ছাইয়ের রঙ তাতে মাখিয়ে দিয়েছে।

অনুপম বলল, 'কী আছে এতে ?'

ইন্দু ক্ষীণ, শুকনো কণ্ঠে বলল, 'দেখ খুলে।'

অনুপম বলল, 'সে তুমি বললেও দেখব, না বললেও দেখব। হাতে হাতে যখন আজ ধরতে পেরেছি তখন কি আর ছেড়ে দেব?'

গিঁট খুলে কাগজের ছেঁড়া টুকরোগুলি হাতের তালুতে নিয়ে একটু তাকিয়ে দেখল অনুপম, তারপর বলল, 'ও প্রেমপত্তর! তাই বল। আমি ভাবলাম কি না কি। হীরের আংটি না মুক্তার মালা।'

ইন্দু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকাল, কোন কথা বলল না।

পরদিন অফিস থেকে তাড়াতাড়িই ফিরে এল অনুপম। ইন্দু ঘরের মেঝেয় বসে হ্যাণ্ড মেসিনে স্বামীরই একটা সার্ট সেলাই করতে বসেছিল, কিন্তু কিছুতেই মন লাগছিল না, বার বার ছিঁড়ে যাচ্ছিল সুতো।

অনুপম তা লক্ষ্য করে বলল, 'আমার জামা আর তোমার মেসিনে উঠতে চাইছে না। কেন মিছিমিছি সুতো নষ্ট করছ।'

ইন্দু একথার কোন জবাব না দিয়ে মেসিন চালিয়ে যেতে লাগল।

অনুপম বলল, 'কলটা থামাও, একটু কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'বল।'

অনুপম বুক পকেট থেকে একখানা খাম বার করে স্ত্রীর হাতে দিল। তাতে চিন্ময়ের নাম ঠিকানা টাইপ করা।

ইন্দু বলল, 'কি এটা।'

অনুপম বলল, 'পড়েই দেখনা। মুখতো আটকানো নয়। এও একরকমের প্রেমপত্র বলতে পার।'

'মানে?'

'পড়ে দেখ।'

ইন্দু বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমার পড়বার সময় নেই। বলতে হয় তুমি বল। তাছাড়া পরের চিঠি আমি কেন পড়তে যাব?'

অনুপম বলল, 'পর! তাইতো? কথাটা বলতে বুক ফেটে গেল না তোমার? কিন্তু বুক ফাটুক আর যাই করুক, ব্যবস্থাটা আমি না করে পারলাম না ইন্দু। চিঠিটা চিন্ময়কে ঘর ছেড়ে দেওয়ার নোটিশ। তাকে এক সপ্তাহের মধ্যে উঠে যেতে হবে। আমি ঘর রিপেয়ার করাব। সে আমার ঘর ভেঙেচুরে নষ্ট করে ফেলছে। উঠে এখান থেকে তাকে যেতেই হবে।'

ইন্দু বলল, 'বেশ তো।'

অনুপম বলল, 'চিঠিটা তুমিই হাতে করে দিয়ে এসো। এ-খামটা পছন্দ না হয় একটা নীল খামের মধ্যে ভরে দাও। বেশ প্রেমপত্র প্রেমপত্র দেখাবে।'

ইন্দু রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'তোমার ভাড়াটে। নোটিশ দিতে হয় তুমি দাও গিয়ে। আমি দিতে পারব না।'

অনুপম বলল, 'তুমি যে দিতে পারবেনা, তা আমি জানি। চিঠিটা রেজেষ্ট্রি করে ডাকে ছেড়ে দিয়ে এসেছি। কাল দশটার মধ্যেই চিঠি ও পাবে, এটা তার কপি। যদি ভালোয় ভালোয় এক সপ্তাহের মধ্যে ঘর ছেড়ে দেয় তো মঙ্গল, না হলে ওর কপালে অশেষ দুঃখ আছে। আমি পাড়ার লোকের সামনে ওকে তাহলে ঘাড় ধরে বের করে দেব।'

অনুপম মুখের ভাষাকে হাতের ভঙ্গিতেও রূপ দিল।

ইন্দু বলল, 'তাই দিয়ো।'

কিন্তু ব্যবস্থাটা তার ভালো লাগল না। নোটিশ দিতে গেল কেন অনুপম? তার চেয়ে মায়েমাকে অন্যভাবে বলে দিলেই তো হোত? ঢাক ঢোল পিটিয়ে লাভ কি।

কিন্তু পিওন এসে চিঠি বিলি করে যাওয়ার দু'তিন দিন পরেও চিন্ময়ের কি হৈমবতীর কোন ভাবান্তর দেখা গেল না, তারা কোন

রকম ভয় পেয়েছে বলে মনে হোল না। তখন অনুপম গিয়ে দাঁড়াল হৈমবতীর রান্নাঘরের সামনে, 'গাট্টি বোঁচকা বাঁধছেন তো মাঐমা, আর কিন্তু মাত্র চারদিন মধ্যে আছে।'

হৈমবতী নোটিশের কথা ছেলের কাছে শুনেছিলেন। অনুপমের কথার জবাবে বিরস মুখে বললেন, 'মধ্যে চার দিনই থাকুক, আর চার ঘণ্টাই থাকুক, বাড়িঘর না পেলে তো আর উঠতে পারব না অনুপম।'

অনুপম তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু উঠতে আপনাদের হবেই। বাড়িঘর না পান পথে গিয়ে দাঁড়াবেন। নোটিশ দেওয়ার পর থেকে এক সপ্তাহের বেশি একদিনও আমি আপনাদের সময় দেব না। কোথাও আশ্রয় না জোটে ফুটপাতে থাকবেন, গাছতলায় থাকবেন। আর সেই হোল আপনাদের ঠিক উপযুক্ত জায়গা। কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে থাকবার যোগ্য আপনার ছেলে নয়।'

ইন্দুর সঙ্গে বেশি মেশামেশি করছে বলে গোড়া থেকেই হৈমবতী ছেলের ওপর অপ্রসন্ন ছিলেন। এ সব ব্যাপার নিয়ে বয়স্ক ছেলেকে যতদূর শাসন করা যায় চিন্ময়কে তা তিনি করছেনও। কিন্তু অনুপমের মুখে ছেলের নিন্দা শুনে তাঁর আর সহ্য হোলনা, তিনি সম্পূর্ণ ধৈর্য হারালেন, গলা ছেড়ে চিৎকার ক'রে বলতে লাগলেন, 'কি, কি বললে অনুপম! চিন্ময় ভদ্রলোকের বাড়িতে থাকবার যোগ্য নয়! কিন্তু পরের ছেলের ঘাড়ে দোষ চাপাবার আগে নিজের পরিবারকে সামলাও অনুপম, নিজের ঘর আগলাও আগে। এতবড় আস্পর্ধা তোমার, আমাকে গাছতলা দেখাতে আস তুমি! কিন্তু তুমি তো তুমি, তোমার মরা বাপ চিতা থেকে উঠে এলেও আমাকে এ ঘর থেকে তুলতে পারবে না। কেন উঠব, মাসে মাসে ভাড়া গুণছি, কেন উঠব?'

চেঁচামেচি শুনে ইন্দু নিচে নেমে এল, 'মাঐমা থামুন, চুপ করুন।'

বিকৃত মুখভঙ্গি করে হৈমবতী তেড়ে এগিয়ে এলেন, 'চুপ করব! কেন রে, কার ভয়ে? নষ্ট, নচ্ছার! ছেলেটার মাথা খেয়ে, এখন নিজে সতীসাধ্বী সেজে বসেছেন।'

ঠিকে ঝি কলতলায় বাসন মাজছিল। ঝগড়া শুনে সে মুখ মুচকে হাসতে লাগল। ইন্দু তাকে চলে যাওয়ার ইসারা করল। কিন্তু ঝির তখন কাজে খুব মন।

ইন্দু হৈমবতীকে বলল, 'আর কেলেঙ্কারী বাড়াবেন না, ঘর ছেড়ে দিয়ে আজই চলে যান আপনারা।'

হৈমবতী বললেন, 'ছেড়ে যাব? তুই আমাকে ঘর ছাড়তে বলবার কে শুনি? আমি আমার ঘরের মধ্যে মরে পড়ে থাকব, তবু ঘর ছাড়ব না। দেখি কার বাপের সাধ্য আমাকে ঘর থেকে তোলে।'

ইন্দুরও আর সহ্য হোল না, সেও এবার চড়া গলায় বলল, 'তুই তোকারি করবেন না মাঐমা। ভদ্রলোকের মত কথা বলুন।'

হৈমবতী বললেন, 'তোরা যে কত ভদ্দর তা আমার জানা আছে।'

এর পর ইন্দুরও মুখ ছুটে গেল। সেও হৈমবতীর অভদ্রতা, সঙ্কীর্ণতার খোঁটা বার বার দিতে লাগল, শেষে বলল, 'তোমাকেও আমার আর চিনতে বাকি নেই, তুমি যে কি রকম ভদ্রলোকের মেয়ে, ভদ্রলোকের স্ত্রী তা আমি তোমার বচন শুনেই বুঝতে পারছি।'

চিন্ময় কাছেই এক বন্ধুর বাসায় গিয়েছিল। ফিরে এসে দুজনের ঝগড়া দেখে, ঝগড়ার ভাষা শুনে মুহূর্তকাল অবাক হয়ে রইল। অনেক কষ্টে মাকে হাত ধ'রে টেনে ঘরে নিয়ে এল চিন্ময়। কিন্তু ইন্দুর মূর্তি দেখে মনে মনে ভারি পীড়া বোধ করল। ভাবতে কষ্ট হোল এই মেয়েকে সে ভালোবেসেছে, কবিতা লিখেছে একে নিয়ে, তার দিনের ভাবনা আর রাত্রির স্বপ্নকে ঘিরে রেখেছে এই মেয়ে।

অনুপম কিন্তু মনে মনে খুসি হোল। চিন্ময়ের মাকে যে চিন্ময়ের মা বলে মোটেই খাতির করেনি, ছেড়ে কথা বলেনি ইন্দু তার জন্ম বহুদিন বাদে খানিকটা তৃপ্তি পেল অনুপম।

কিন্তু একটু পরেই ইন্দু বলল, 'কাজটা ভালো হোল না। ছিঃ।'

ইন্দুর মুখে লজ্জা আর অনুশোচনার ছাপ দেখে ফের ভ্রূ কুঁচকালো অনুপম, বলল, 'ভালো না হবার কি হোল। বেশ হয়েছে। ফের যদি চেঁচামেচি করে আর ওসব কথা বলে, আমি পুলিশে খবর দেব।'

ইন্দু বলল, 'ছিঃ। নোটিশ দিয়েছিলে দিয়েছিলে, তুমি ফের আবার ও কথা বলতে গেলে কেন?'

অনুপম স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হুঁ দোষটা তো আমারই।'

ইন্দু বলল, 'না দোষ তোমার নয়, দোষ আমার ভাগ্যের।'

অনুপম বলল, 'ভাগ্য ভাগ্য ক'রনা, দোষ তোমার প্রবৃত্তির।'

ইন্দু নিশ্বাস ছেড়ে চুপ ক'রে রইল। আর বাদানুবাদে যোগ দিল না। মনে মনে ভাবল প্রবৃত্তির দোষ কি তার একার?

মাকে কোন বন্ধুবান্ধবের বাসায় তুলবে বলে ঠিক করল চিন্ময়। নিজে আপাতত একটা মেস টেস ঠিক ক'রে নেবে। সেই চেষ্টায় বিকালের দিকে বেরোবার উদ্যোগ করছিল, হৈমবতী ক্লান্ত স্বরে তাকে ডাকলেন, 'আজ আর কোথাও যাসনে চিনু, আয় এখানে বোস এসে আমার কাছে।'

চিন্ময় মার ঘরে এসে দেখল তিনি বিছানায় শুয়ে পড়েছেন। আজ আবার ফের তাঁর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। মার চেহারা দেখে চিন্ময় চমকে উঠল।

সকালের ঝগড়ার ফলটা হৈমবতীর শরীরের পক্ষে মোটেই ভালো হয়নি। সমস্ত দুপুর আর বিকালটা তিনি অশ্রান্ত কেঁদেছেন, নিজের

ভাগ্যকে দোষ দিয়েছেন, চিন্ময়কে গালমন্দ করেছেন, অনুপমকেও শাপমন্যি দিতে বাকি রাখেননি। চিন্ময় কখনো অনুরোধ করেছে, কখনো ধমক দিয়েছে, কিন্তু কিছুতেই হৈমবতী ক্ষান্ত হননি।

চিন্ময় মার মাথার কাছে বসে খানিকক্ষণ তার কপালে হাত বুলাল। তারপর এক সময় উঠে পড়ে বলল, 'তুমি একটু চুপ করে থাক মা, আমি এক্ষুণি ডাক্তারবাবুকে একটা খবর দিয়ে আনছি।'

হৈমবতী বাধা দিয়ে বললেন, 'না, না, ডাক্তারে দরকার নেই আমার। তুই স্থির হয়ে আমার এখানে বোস তো।'

চিন্ময় বলল, 'আমি তো বসবই মা, সারারাত তোমার কাছে বসে থাকব। তুমি ভেবনা, আমি এলাম ব'লে।'

চিন্ময় বেরিয়ে গেল।

আধঘণ্টাখানেক বাদে ব্যোমকেশবাবুর গাড়ি এসে দাঁড়াল 'ভূপতি-ভবনের' সামনে।

ব্যোমকেশবাবু ভিতরে এসে রোগিণীকে পরীক্ষা করে মুখ গম্ভীর করলেন। হৈমবতীর অসুখ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কয়েকটি প্রশ্ন ক'রে মা কি ছেলে কারো কাছ থেকেই যথাযথ সদুত্তর না পেয়ে বিরক্ত হলেন। তারপর বেশ একটু অসহিষ্ণু ভঙ্গিতেই বললেন, 'না মশাই আপনি কোন কাজের নন। সেই মহিলাটি গেলেন কোথায়? আপনার বান্ধবী?' মৃদু হাসলেন ব্যোমকেশবাবু, 'তাঁকে ডাকুন, তাঁকেই সব বুঝিয়ে শুনিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।'

চিন্ময় বলল, 'তিনি আসবেন না।

ব্যোমকেশবাবু শাদা কাগজে দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে প্রেসক্রিপসন লিখতে লাগলেন। তারপর চিন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আসবেন না? কেন?'

চিন্ময় বলল, 'চলুন ওঘরে গিয়ে বলব।'

হাতঘড়ির দিকে একটু তাকিয়ে ব্যোমকেশবাবু বললেন, 'চলুন।'

চিন্ময়ের ঘরে এসে জানালার ধারঘেঁষা চেয়ারটায় বসলেন ব্যোমকেশবাবু। অগোছাল ঘরের অবস্থা দেখে বললেন, 'ঈস, একেবারে জড়িয়ে ছড়িয়ে রয়েছেন দেখছি! হ্যাঁ, কি বলবেন বলছিলেন? বেশি সময় নেই আমার, আর একটা কেস আছে। এক্ষুণি ছুটতে হবে।'

চিন্ময় বলল, 'তাহলে আজ থাক।'

ব্যোমকেশবাবু একটু হাসলেন, 'অমনি রাগ হয়ে গেল? নাঃ আপনাকে নিয়ে পারা গেল না। বলুন না কি ব্যাপার, ওঁর আসবার বাধাটা কি?'

চিন্ময় সংক্ষেপে বলল, 'ওঁদের সঙ্গে আজ ঝগড়া হ'য়ে গেছে।'

ব্যোমকেশবাবু হেসে বললেন, 'ঝগড়া? মানে দ্বন্দ্ব? দ্বন্দ্বের আবার দুটো মানে, তাইনা?'

হঠাৎ টেবিলের ওপর দোয়াতে চেপে রাখা একখানা লেখা কাগজের উপর দৃষ্টি পড়ল ব্যোমকেশবাবুর। কবিতাটি তুলে নিয়ে পড়ে বললেন, 'বেশ। হাতের লেখাটা তো কোন মেয়ের বলে মনে হচ্ছে।'

চিন্ময় বলল, 'কিন্তু রচনাটা পুরুষের।'

ব্যোমকেশবাবু চিন্ময়ের দিকে তাকিয়ে ফের একটু হাসলেন 'সেটা বোঝা শক্ত নয়।'

তারপর কবিতাটি আর একবার পড়লেন ব্যোমকেশবাবু, আর একবার তাকালেন চিন্ময়ের দিকে, বললেন, 'কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

'করুন না।'

ব্যোমকেশবাবু স্থিরদৃষ্টিতে চিন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সত্যি করে বলুন তো আপনার কথা আর কামনাই কলহের মূল কারণ কিনা?'

চিন্ময় কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল।

ব্যোমকেশবাবু হঠাৎ বললেন, 'ছিঃ আপনার কাছ থেকে এটা আশা করিনি চিন্ময়বাবু।'

চিন্ময় একটু শ্লেষের স্বরে বলল, 'আপনার মুখে ও কথা সাজে না।'

ব্যোমকেশবাবু স্তব্ধ হয়ে গেলেন। চিন্ময়ের দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইলেন, তারপর মৃদু মোলায়েম স্বরে বললেন, 'সাজে না কারণ আমার যৌবনের কিছু কিছু ঘটনা আপনাকে বলেছি। কিন্তু বার্ধক্যের একটা গল্প আপনাকে আজ শোনাব।'

চিন্ময় বলল, 'কিন্তু আমি তো বৃদ্ধ নই, ডাক্তারবাবু, বার্ধক্যের গল্প শুনতে আমার স্পৃহা নেই।'

চিন্ময়ের উত্তেজনা দেখে ব্যোমকেশবাবু হাসলেন, 'এ জিনিস কিন্তু চিন্ময়বাবু বৃদ্ধদের জন্যই, আর রসে যারা সমৃদ্ধ তাদের জন্য। আপনাদের মত কাঁচা বয়সের কাঁচা প্যাসনের জিনিস এ নয়। যখন কামনার নব রঙ দুজনের চুলের শাদা রঙে একেবারে পাকা হয়ে লাগে এ শুধু তখনকার বস্তু। তখন আর আলাদা করে কবিতা লিখে রঙ লাগাবার দরকার হয় না, কোন সংসারে আগুন জ্বালাবার দরকার হয় না—'

চিন্ময় আগের মত দীপ্ত কণ্ঠে বলল, 'সব দরকার হয়, ডাক্তার বাবু, সব দরকার হয়। ছাব্বিশ বছরের দরকারকে কি ছেষট্টি বছর বয়সে এসে বোঝা যায় না স্বীকার করা যায়? কবিতা লিখে আগুন জ্বালানো যায় না, যে আগুন জ্বলে তাতে কেবল নিজেকেই পুড়তে

হয়, আমি তা জানি। কিন্তু আমি কেবল কবিতাই লিখব, এ কথা ভাবছেন কেন? আমি কি আর কিছু করতে পারিনে?'

ব্যোমকেশবাবু হেসে মাথা নাড়লেন, 'আর কিছু করাটা আরো নির্বোধের কাজ হবে।'

একটু থেমে ব্যোমকেশবাবু ফের বললেন, 'চলুন, ওষুধ নিয়ে আসবেন ডিসপেনসারি থেকে, আর ওঁর নার্সিং-এর ব্যবস্থা কালই করবেন। যদি আত্মীয়স্বজন কাউকে না পান, নার্স রাখুন, না হয় হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন।'

চিন্ময় বলল, 'কিন্তু মা কখনও হাসপাতালে যেতে চান না।'

ব্যোমকেশবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, 'দেখা যাক দু'একদিন।'

মাকে বলে চিন্ময় ওষুধ আনবার জন্য ব্যোমকেশবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

অফিসে যাওয়ার সময় অনুপম হৈমবতীর ঘরে একবার উঁকি দিয়ে গেল, 'কেমন আছেন মাঐমা? ডাক্তার এসেছিলেন? ওষুধ পথ্য খাচ্ছেন তো?'

হৈমবতী ঘাড় নেড়ে বললেন, 'হুঁ।'

এর আগেও সকাল সন্ধ্যায় অনুপম দু'তিনবার ক'রে হৈমবতীকে মাঐমা বলে ডেকেছে। কিন্তু তখনকার স্বর এখনকার ডাকের মধ্যে বাজল না। তা যে ডাকল সেও টের পেল, যিনি শুনলেন তিনিও বুঝলেন।

অনুপম আর কোন কথা না বলে সদরের দিকে এগিয়ে গেল। পিছন থেকে মিনু ডাকল, 'বাবা।'

অনুপম ফিরে তাকাল, 'কিরে?'

মিনু মুখ ভার করে বলল, 'আমার জন্যে পুতুল আনলে না বাবা! আমার সবগুলি পুতুল যে ভেঙে গেছে।'

অনুপম বলল, 'ভেঙে গেছে? কেবল কি তোর পুতুল? সবই ভেঙে যাচ্ছেরে মিনু।'

হঠাৎ অনুপমের চোখে পড়ল ইন্দু দোতলা থেকে নেমে এসেছে। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে হৈমবতীর ঘরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। চিন্ময়কেও দেখা যাচ্ছে সে ঘরে।

মিনুকে কোলের কাছে টেনে নিল অনুপম, তারপর কি ভেবে পকেট থেকে একটা টাকা মেয়ের হাতে তুলে দিল।

মিনু খুসি হয়ে বলল, 'পুরো একটা টাকা বাবা? পুতুল কিনতে দিচ্ছ? আমার অনেকগুলি পুতুল হবে, না বাবা?'

অনুপম ওপরের দিকে চোখ তুলে আর একবার অন্যমনা স্ত্রীর দিকে তাকাল। একটু কাল কি ভাবল, তারপর মিনুকে সদরের কাছে ডেকে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'শোন্, তোর মা নিচের ঘরে যায় কিনা, কবার যায়, কতক্ষণ থাকে কার সঙ্গে বসে গল্প করে লক্ষ্য রাখবি। বাড়ি এলে আমাকে বলবি। তাহ'লে তোকে পুতুল কেনার জন্যে আরো টাকা দেব। পারবি বলতে?'

মিনু হেসে ছোট ছোট দাঁতগুলি বের করল, 'খুব পারব বাবা। এ তো বেশ মজার খেলা।'

অনুপম বলল, 'হ্যাঁ, মজার খেলাই তো।'

ইন্দু এদিকে আসছে দেখে অনুপম তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। তার অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

একটু বাদেই মেয়ের হাতের টাকাটা চোখে পড়ে গেল ইন্দুর।

'এ টাকা পেলি কোথায়?'

মিনু দু'পা পিছিয়ে গিয়ে দুষ্টু হেসে বলল, 'বলব কেন। বাবা দিয়ে গেছে আমাকে। আমার টাকা।'

ইন্দু বলল, 'একটা টাকাই দিয়ে গেলেন? হারিয়ে ফেলবি। দে আমাকে রেখে দিচ্ছি। বিকালে যা কিনবার কিনিস।'

মিনু ছোট্ট মুঠির মধ্যে এক টাকার নোটটা চেপে ধরল, 'উঁহু এ টাকা দেব না, এ টাকা আমার।'

'দে বলছি, বেয়াড়া মেয়ে।'

জোর করে মিনুর হাত থেকে টাকাটা কেড়ে নিল ইন্দু।

আর সঙ্গে সঙ্গে মিনু চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল 'আমি সব বলে দেব, সব বলে দেব।'

ইন্দু হেসে বলল, 'কি বলবি তুই?'

মিনু তেমনি সরোদনে বলতে লাগল 'আমি সব জানি, সব বলব। তুমি ওদের ঘরে যাও, ওদের সঙ্গে কথা বল। আরো বেশি করে বলব, বানিয়ে বানিয়ে বলব। আমি বলব বলেই তো বাবা টাকা দিয়ে গেছে। আমার বাবার টাকা তুমি কেন নিলে, কেন কেড়ে নিলে?'

ইন্দু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে পরম ঘৃণায় টাকাটা মেয়ের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। অনুপম ঠিকই বলেছে। টাকার জোরে অনুপম সব কিনে নিতে পারে, সব তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে। সেই মুহূর্তে ইন্দুর মনে হোল তার কেউ নেই, এ সংসারে তার কেউ নেই। স্বামী নেই সন্তান নেই কিচ্ছু নেই তার। সে কারো স্ত্রী নয়, মা নয়, কন্যা নয়—তবে সে কী, তবে সে কে?

বিকাল থেকেই রান্নার আয়োজন শুরু করতে হয়। কিন্তু রান্না ঘরে যেতে আজ আর কিছুতেই ইচ্ছা করছিল না ইন্দুর। নিতান্ত অনিচ্ছায় অতিকষ্টে নিজের দেহটাকে যেন টেনে নিয়ে চলল ইন্দু। কিন্তু ঘরের সামনে গিয়ে বঁটি পেতে বসতে না বসতে তিলক

হাঁপাতে হাঁপাতে নিচ থেকে ওপরে উঠে এল, 'মা, মা, দেখবে এস নিচের ঘরের বুড়ীটা জল জল করে মরছে।'

তিলু আর মিন্টু এতদিন হৈমবতীকে ঠাকুরমা বলে ডাকত। কিন্তু কিছুদিন ধরে ওরাও টের পেয়েছে চিন্ময়দের সঙ্গে তাদের বাবা মার খুব ঝগড়া হয়েছে। কালকের ঘটনার পর সে কথা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তিলু মিন্টুর কাছে। তা ছাড়া নিচের ভাড়াটে-দের দু'চার দিনের মধ্যে জোর করে তুলে দেওয়া হবে, একথাও তিলকের বুঝতে বাকি নেই। তাই ঠাকুরমা এখন বুড়ী ছাড়া কেউ নয়।

ইন্দু ধমক দিয়ে বলল, 'ছিঃ বুড়ী বলে নাকি। ঠাকুরমা বল তিলু।'

তিলক অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'ঠাকুরমা জল চাইছে মা, আমার ভয় করছে যেতে।'

ইন্দু বলল, 'জল চাইছেন। কেন চিন্ময় ও ঘরে নেই ?'

তিলক বলল, 'না, বোধ হয় ডাক্তারখানায় গেছেন।'

তা হতে পারে। কিন্তু ওর কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। এমন একজন রোগীকে একা এক ঘরে ফেলে রেখে কেউ কি বেরোয় ?

বেরোবেই যদি ইন্দুকে একটু বলে গেলেই হোত।

ছেলেকে সহবৎ শেখানো বন্ধ রেখে ইন্দু ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল।

তিলু ঠিকই বলেছে। সত্যিই জল চাইছেন হৈমবতী।

একটু ইতস্তত ক'রে ইন্দু ঘরে ঢুকল। দিনের বেলায়ও ঘরখানা কেমন অন্ধকার অন্ধকার। তক্তপোষের একধারে কাত হয়ে হৈমবতী পড়ে রয়েছেন। শিয়রের কাছে থুথু ফেলবার পিকদানী, গোটা দুই অনাবশ্যক কৌটো, আধখানা বেদানা। বিছানাটাও ময়লা। কেবল

ছেলেকে দোষ দিলে কি হবে তার মা'টিও তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়, ঘর দোর তেমন সাজাতে গুছাতে জানেন না। আজই না হয় অসুখ হয়েছে, কিন্তু যখন সুস্থ থাকেন তখনও পরিপাটিভাবে থাকতে পারেন না। ইন্দু আলগোছে পিকদানি আর কৌটো দুটো সরিয়ে ফেলল।

মানুষের সাড়া পেয়ে হৈমবতী এবার পাশ ফিরলেন। ইন্দুকে ভালো করে দেখতে না পেয়ে বললেন, 'কে।'

ইন্দু বলল 'আমি মায়ৈমা। আপনি জল চাইছিলেন, জল দেব?'

হৈমবতী রুক্ষস্বরে বলে উঠলেন, 'না, আমার জল টল কিছু চাইনে। তোমাকে কে এখানে আসতে বলল, তুমি যাও বাছা, তুমি যাও এখান থেকে। গাছের গোড়া কেটে আর আগায় জল ঢালতে হবে না তোমাদের।'

ইন্দু মৃদু হাসল, একটু সস্নেহ ধমকের সুরে বলল, 'অমন করে নাকি মায়ৈমা। আমি জল এনে দিচ্ছি খান।'

হৈমবতী যেন ষাট বছরের বৃদ্ধা নন ছোট একটি মেয়ে। অবুঝ রাগ আর অভিমানের জন্যে তাকে সস্নেহ শাসন করছে ইন্দু।

ঘটিতে কি কুঁজোয় কোথাও একফোঁটা জল নেই। তাড়াতাড়ি কুঁজোটা ধুয়ে তাতে জল ভরে নিয়ে এল ইন্দু। হৈমবতীর ঘটিতে খানিকটা জল ঢেলে তাঁর কাছে নিয়ে এসে বলল, 'আপনি নিজে খেতে পারবেন, না আমি ঢেলে দেব।'

হৈমবতী তবু জেদ ছাড়েন না, 'ও জল আমি খাব না।'

ইন্দু তেমনি হেসে বলল, 'ছিঃ অমন করে না মায়ৈমা, জলটুকু খান। মানুষে মানুষে ঝগড়া বিবাদ বুঝি হয় না, তাই বলে অসুখ বিসুখের সময় অমন করে নাকি? আপনিও দেখি মিনুর মত হলেন।'

হৈমবতী এবার আর আপত্তি করলেন না। ঘটি উঁচু করে ইন্দু তার মুখে জল ঢেলে দিল।

একটু বাদে ইন্দু জিজ্ঞাসা করল 'পথ্য টথ্য কিছু খেয়েছেন?'

হৈমবতী বললেন, 'না, কি আর খাব। কিছু খেতে ভালো লাগে না।'

ইন্দু বলল 'অসুখ হ'লে খেতে কি আর ভালো লাগে মাসিমা। জোর করে খেতে হয়। নইলে অসুখ যে আরো পেয়ে বসে। আচ্ছা পথ্য আমি তৈরী ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে বিছানাটা যে ঝেড়ে দিতে হবে। আর ধোয়া চাদর আছে?'

হৈমবতী বললেন, 'আর ধোয়া চাদর নষ্ট করে কি হবে।'

ইন্দু হেসে বলল, 'আচ্ছা কৃপণ মানুষের মেয়ে তো আপনি। চাদর নষ্ট হবে বলে এই ময়লা বিছানায় পড়ে থাকবেন। কোথায় ধোয়া চাদর আছে বলুন।'

হৈমবতী বললেন, 'তোমার জ্বালায় আর পারলুম না। ওই বাক্সের মধ্যে চাদর আছে দেখ। এই নাও চাবি।'

শুধু বিছানায় চাদর বদলাল না ইন্দু ঘরখানাও ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করল। হৈমবতীর জিনিসপত্রগুলি গুছিয়ে রাখল একধারে। মনে হোল ঘরখানাই যেন বদলে গেছে। এরপর নিজের রান্নাঘরে গিয়ে উনুন ধরিয়ে হৈমবতীর জন্যে একটু দুধ গরম করে নিয়ে এল ইন্দু। তিনি আবার ওজর আপত্তি শুরু করলেন। অনেক অনুরোধ উপরোধের পর তিনি খেতে রাজী হলেন। ইন্দু দুধের বাটিটা সবে তার মুখের কাছে নিয়ে ধরেছে চিন্ময় এসে উপস্থিত হোল। তার হাতে ওষুধের শিশি আর একটা ফলের ঠোঙ্গা। ইন্দুকে তাদের ঘরে এমন অবস্থায় দেখে একটু বিস্মিত হোল চিন্ময়। একটু কাল

দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। তারপর জুতো ছেড়ে নিঃশব্দে ঘরে এসে ঢুকল।

পায়ের শব্দে ইন্দুও মুখ তুলে তাকিয়েছিল। চিন্ময়কে দেখেই তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল, আরক্ত হয়ে উঠল মুখ, হাতের বাটিটাও একটু কেঁপে গেল যেন।

ইন্দু হৈমবতীকে মৃদুস্বরে বলল, 'আপনি খেয়ে নিন মায়েমা। আমি একটু পরে এসে বাটিটা নিয়ে যাবো।'

চিন্ময়ের দিকে আর না তাকিয়ে তার সঙ্গে কোন কথা না বলে ইন্দু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চিন্ময় একটু কাল মুগ্ধদৃষ্টিতে ইন্দুর সেই দ্রুত গতিভঙ্গির দিকে তাকিয়ে রইল। এমন লজ্জা ইন্দু তাকে দেখে আর কোনদিন পায়নি। ও কি ভেবেছিল লুকিয়ে লুকিয়ে সেদিন যেমন এসে চিন্ময়ের কবিতার কপি করে রেখে গেছে তার মায়ের সেবাও তেমনি অলক্ষিত ভাবেই ক'রে যাবে? ধরা দেবে না, ধরা পড়বে না? চিন্ময় মনে মনে একটু হাসল।

ঘরের দিকে তাকিয়ে মন ভারি প্রসন্ন হয়ে উঠল চিন্ময়ের। লক্ষ্মীর হাতের ছোঁয়া যে লেগেছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এগিয়ে এসে হৈমবতীর মাথার কাছে বসল চিন্ময়, জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ মা?'

হৈমবতী একটু বিরক্তির ভঙ্গিতে বললেন, 'সে খবরে তোমার কাজ কি বাপু। সারাদিন তুমি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ালে। তেষ্টায় মরে গেলেও তোমার কাছ থেকে একটু জলের প্রত্যাশা নেই, শেষে পরের মেয়ের হাতে—'মার রাগ আর অভিযোগের মধ্যে অনেকখানি যে ভাণ আছে তা টের পেয়ে চিন্ময় মৃদু হাসল, তারপর একটু তরল স্বরে বলল, 'তাতে আর এমন দোষ কি হয়েছে মা। তোমার নিজের ঘরের বউ হ'লে সেও পরের মেয়েই হোত।'

বলে নিজেই ভারি লজ্জা পেল চিন্ময়। ছি ছি মা কি ভাবলেন। কিন্তু হৈমবতী অত তলিয়ে দেখলেন না।

তিনি বললেন, 'সে ভাগ্য কি তুমি আমার হ'তে দিলে বাছা অমন একটি লক্ষ্মীর মত বউ ঘরে আনতে পারলে আমার আর দুঃখ ছিল কিসের। আহা কি যত্নটাই না করলে!'

চিন্ময় স্মিতমুখে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে সিগারেট ধরাল।

তারপর থেকে হৈমবতী কেমন আছেন দেখবার জন্যে রোজই একবার করে আসতে লাগল ইন্দু। চিন্ময় যখন ঘরে থাকে তখন আসেনা, সে যখন বাইরে চলে যায় কি নিজের ঘরে বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকে তখন এসে ইন্দু রোগিণীর সেবা পরিচর্যা ক'রে যায়। চিন্ময়ের সঙ্গে যেন তার কোন সম্পর্ক নেই। তার মার সঙ্গেই যেন ইন্দুর শুধু আত্মীয়তা।

চিন্ময় মনে মনে হাসে, এ এক রকম মন্দ নয়। এতদিন তাদের মধ্যে আলাপ আলোচনার অন্ত ছিলনা। কত কথা আর কত কথা কাটাকাটি যে তাদের হয়েছে তার আর ঠিক নেই। আজ চলছে বিনা কথার পালা। কিন্তু এ আলাপও একেবারে নীরব নয়, এর ধ্বনি আছে তা কান পেতে শোনা যায় না মন দিয়ে অনুভব করতে হয়। ইন্দু যে তার সামনে পড়লে আজকাল বিব্রত হয়' লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি সরে যেতে বাধ্য হয়, চিন্ময়ের চোখে তা বড়ই মনোরম লাগে। এ যেন কিশোরী বধূর লজ্জার অবগুণ্ঠণ, এ আড়াল দুরত্ব সৃষ্টি করেনা, মধুরত্ব বাড়ায়। এই লজ্জার মধ্যে বারবার এমন ক'রে এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে চিন্ময়কে স্বীকৃতি দিয়েছে ইন্দু। আর চিন্ময়ের মনে কোন ক্ষোভ নেই।

চিন্ময় সম্বন্ধে নিজের এই নতুন ধরণের সংকোচ দেখে ইন্দু নিজেও বড় অস্বস্তি বোধ করে। তার এই লজ্জাকে সে কিছুতেই স্বীকার করতে চায়না। লজ্জা আবার কিসের। লজ্জা সে চিন্ময়কে করেনা, ওর সঙ্গে যে কথা বন্ধ করেছে তা জেদ ক'রে। অনুপম দেখুক, সমস্ত জগৎ সংসার দেখুক ইন্দুকে তারা যা ভাবছে তা সে নয়। চিন্ময়ের ঘরে না গিয়ে, চিন্ময়ের সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রে সে জন্ম জন্মান্তর কাটিয়ে দিতে পারে। চিন্ময়েরও শিক্ষা হোক, ইন্দুকে লক্ষ্য ক'রে যে তার মোটেই ভালো হয়নি ইন্দু তা একটুও পছন্দ করেনি আর সেই জন্যেই তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেছে সেকথা বুঝতে পারুক চিন্ময়। কিন্তু ওকে দোষ দেবে কি ইন্দুর নিজের হৃদয়ই বড় অবুঝ। হৃদয় নয়, হৃদপিণ্ড। চিন্ময় কাছাকাছি এলে তার স্পন্দন এত দ্রুত হয় এত ধ্বনিময় হয়ে ওঠে যে ইন্দুর আশঙ্কা হয় বুঝি তা চিন্ময়েরও কানে গেল। আশঙ্কা হয় বুঝি চিন্ময় তাকে কিছু বলে ফেলবে। যদি এতদিন বাদে ও মৌনতা ভাঙে তাহলে কি ইন্দু সঙ্গে সঙ্গে কথা বলবে, নাকি নিঃশব্দে ও চলে আসবে? কোনটা শোভন আর সঙ্গত হবে, ভেবে যেন ঠিক ক'রে উঠতে পারেনা ইন্দু।

অনুপমের অমোঘ এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল কিন্তু চিন্ময়রা নড়বার নাম করলনা। ভারি অসুবিধেয় পড়ল অনুপম। সুবিধে মত বুড়ীটা অসুখ বানিয়ে নিয়েছে। এ অবস্থায় বার বার উঠে যাওয়ার তাগিদ দেওয়াও ভালো দেখায়না। কিন্তু অনুপমই বা আর কতদিন অপেক্ষা করবে। তার আর ইচ্ছা নয় ওরা এক মুহূর্ত এ বাড়িতে থাকে, সে এরই মধ্যে অন্য লোকজনের সঙ্গে ঘর ভাড়া দেওয়া সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা শুরু করেছে। একজনের সঙ্গে কথাবার্তা প্রায়

ঠিকই করে ফেলেছে। তারই অফিসের কলগ, প্রোপোজালী ডিপার্টমেন্টের নিরঞ্জন বোস। সে অবিবাহিত নয় স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে আছে। বই পড়ার বাতিক নেই। অনুপমের মতই কাঠখোট্টা বস্তু জগতের মানুষ। তাকে বিশ্বাস করা যায়, তার ওপর নির্ভর করা যায়। সে চিন্ময়ের মত মিটমিটে শয়তান নয়। কিন্তু বুড়ী যে মরেওনা, নড়েওনা তার কি করা যাবে।

ইন্দুকে ডেকেই জিজ্ঞাসা করল অনুপম, 'চিনুর মা কি অনন্তশয্যা বিছাল নাকি? তার অসুখ সারল না?'

ইন্দু বলল, 'ব্লাডপ্রেশারটা কমেছে। কিন্তু কাল দেখে এলুম রক্তআমাশা শুরু হয়েছে। রোগের পর রোগ বুড়ো মানুষ বড় কষ্ট পাচ্ছেন?

অনুপম বলল, 'কাল দেখে এলুম মানে? তুমি কি ওদের ঘরে গিয়েছিলে নাকি?'

ইন্দু একটু থমকে গিয়ে বলল, 'হ্যাঁ গিয়েছিলাম।'

অনুপম স্থির দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকাল, 'আমি যখন বাড়ি থাকিনে তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে রোজই তাহ'লে যাও? আর এদিকে তিলু মিনুকে বেশ মিথ্যে কথা শিখিয়ে রেখেছ। তারা জিজ্ঞেস করলে বলে, 'না মা তো যায় না।'

স্বামীর অভিযোগের ধরণ দেখে ইন্দুর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। ইন্দু তীব্রস্বরে বলল, 'তোমার মত অমন হীন প্রবৃত্তি আমার হয়নি যে ছেলে মেয়েকে মিথ্যে কথা শেখাবো। তারা যদি মিথ্যে বলে থাকে তোমার ভয়েই বলেছে।'

অনুপম অদ্ভুত একটু হাসল, 'আর আমার ভয়ে তুমিও বুঝি সত্য গোপন করেছ। কি সতী-সাধ্বী সীতা-সাবিত্রীরে। রোজ আমাকে লুকিয়ে ওদের ঘরে তুমি যাও। সত্যি কথা বল।'

ইন্দু বলল, 'মিথ্যে কথা আমি কোনদিন বলিনে। বুড়ো মানুষ রোগে কষ্ট পাচ্ছেন। ঘরে আর কোন মেয়েছেলে নেই যতটুকু পারি ওঁর সেবা করি ওষুধটুকু পথ্যটুকু দরকার মত দিই, এতে লুকোবার কি আছে অন্যায়েরই বা কি আছে। আমি তো আর চিন্ময়ের সঙ্গে কথা বলিনে, কি তার ঘরেও যাইনে।'

অনুপম শ্লেষ ক'রে বলল, 'সেই দুঃখে বুক ফেটে যায়, না? কিন্তু তার মার কাছে গেলেও তো তোমার আনন্দ, নতুন শাশুড়ীর সেবা করায়ও তো তোমার সুখ।'

ইন্দু মুহূর্তকাল কোন কথা বলতে পারলনা, চেঁচিয়ে উঠে তারপর বলল, খবরদার, তুমি কি ভেবেছ তোমার যা মুখে আসে তাই বলবে?'

অনুপম ফের একটু হাসল, 'তুমি যদি তোমার যা মনে আসে তাই বলতে পার আমার বেলায় মুখে বললেই দোষ? এমন কি আর অন্যায় বলেছি। শাশুড়ী না হোক শাশুড়ীর মতই তো।'

ইন্দু বলল, 'হাজার বার। তোমার মা বেঁচে থাকলে ওঁর চেয়েও বুড়ো হতেন। আমি ওঁর সেবা করে তাঁর সেবা করছি।

অনুপম ব্যঙ্গ করে বলল, 'ঈস্, কি একখানা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল রে! অতই যদি সেবাধর্মের সখ, কোন আশ্রম টাশ্রমে চলে গেলেই পার। ঘরে থেকে আমাকে জ্বালিয়ে মারছ কেন।'

স্ত্রীর আরো কাছে এগিয়ে এল অনুপম। তারপর হুকুমের ভঙ্গিতে বলল, 'শোন ওসব নার্সগিরি এখানে থেকে চলবেনা। তুমি মেয়ে মানুষ তুমি আমার স্ত্রী, তোমাকে আমার কথা শুনে চলতে হবে।'

ইন্দু একটুকাল স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে শান্ত স্থির স্বরে বলল, 'আমি আগে মানুষ তারপর আমি তোমার স্ত্রী। তোমার সব অন্যায় আবদার আমি মেনে নিতে পারব না। তুমি আমার

কাছে অন্য সব পুরুষের চেয়ে বড় কিন্তু আমার বিবেকের চেয়ে বড় নও।'

অনুপম স্ত্রীর এই দৃঢ়তা দেখে একটুকাল বিস্মিত হয়ে রইল। তারপর তেমনি শ্লেষভরা গলায় বলল, 'বটে! এই বিবেকটি কে শুনি? চিন্ময় নাকি? সেই বোধহয় তোমাকে এসব স্বাধীন জেনানার বুলি শিখিয়েছে? আমার সামনে দাঁড়িয়ে, আমাকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলবার সাহস আগে তো তোমার ছিলনা!'

'অন্যায়কে অন্যায় বলবার সাহস আমার চিরকালই ছিল, চিরকালই থাকবে।' বলে ইন্দু পাশের ঘরে চলে গেল।

জেদী স্ত্রীর এই দৃপ্ত ভঙ্গি দেখে ভারি রাগ হোল অনুপমের। কিন্তু সবটুকুই যেন রাগ নয়। ভিতরে ভিতরে কোথায় যেন একটু আশ্বাসও ওর ভঙ্গির মধ্যে আছে। তাহলে হয়ত তেমন কোন মারাত্মক অপরাধ ইন্দু করেনি। যে স্ত্রী অসতী হয়, অপরাধিনী হয় সে কি এমন তেজের সঙ্গে কথা বলতে পারে, এমন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে স্বামীর সামনে। লোকের অসুখ বিসুখে? ইন্দুর সেবা করবার প্রবৃত্তিটা অনুপম আগেও লক্ষ্য করেছে। গাঁয়েই হোক আর শহরেই হোক পাড়াপড়শীর কারো অসুখ হয়েছে শুনলে ইন্দু তার খোঁজখবর নিতে যায়। সে রোগী যদি শিশু হয় বুড়ো হয় কি স্ত্রীলোক হয় সাধ্যমত ইন্দু গিয়ে তার শুশ্রূষাও করে। হয়ত হৈমবতীর ওপর ওর বিশেষ তেমন পক্ষপাত নেই। কিন্তু অনুপমের নিষেধ সত্ত্বেও কেন সে যাবে।

রাগ করে কয়েকদিন হৈমবতীর খোঁজখবর নেওয়া বন্ধ রাখল ইন্দু। শুধু রাগ নয়, কেমন একটা লজ্জাও যেন তাকে বাধা দিচ্ছে। অনুপম যে সব খোঁটা দিয়েছে, যে সব বিশ্রী কথা বলেছে তাতে যেন ওঘরে আর যাওয়া যায় না। একপা এগিয়ে ইন্দু দু'পা

পিছিয়ে আসে। সত্যিই কি অমন আত্মীয়ের মত, একান্ত আপন জনের মত হৈমবতীর সেবা করা ইন্দুর মনের দুর্বলতা, চিন্ময়ের ওপর তার অনুরাগের নামান্তর? মাথা নেড়ে জোর করে অস্বীকার করে ইন্দু, কিন্তু যাওয়ার সময় পায়ে যেন তেমন জোর পায়না। এদিকে সেবা শুশ্রূষায় অপটু একজন পুরুষের হাতে অসুস্থ বুড়ো মানুষ কষ্ট পাচ্ছেন দেখে ইন্দুর বিবেক পীড়িত হতে থাকে।

এমনি করে দিন তিনেক কাটল। সেদিন বৃহস্পতিবার। লক্ষ্মীর আসনের কাছে ধূপ-দীপ জেলে পুরোন লালপেড়ে গরদের শাড়ি খানা পরে পুঁথি নিয়ে বসেছে, চিন্ময় প্রায় ঝড়ের মত ঘরে ঢুকল, 'ইন্দুদি শিগগির আসুন মা যেন কেমন করছেন।'

ইন্দু বলল, 'সেকি?'

তারপর ছেলের হাতে লক্ষ্মীর পুঁথি দিয়ে ইন্দু চিন্ময়ের পিছনে পিছনে নেমে এল নিচে। গিয়ে দেখল হৈমবতীর অবস্থা এই কদিনে আরো খারাপ হয়েছে। বিছানার সঙ্গে লেগে গেছে তার শরীর। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, তাঁর হৃদরোগ আর আমাশা দুইই বেড়েছে।

তাঁর অবস্থাটা একটু দেখে নিয়ে ইন্দু চিন্ময়কে বলল, 'ভয় নেই তুমি যাও, ডাক্তারবাবুকে খবর দাও। আমি এখানে আছি।'

চিন্ময় চলে গেলে হৈমবতীর বুকে আস্তে আস্তে ইন্দু হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, কোমল মৃদুস্বরে বলল, 'ভয় নেই মায়েমা আপনার কোন ভয় নেই।'

ইন্দুর শুশ্রূষায় খানিকটা সুস্থ বোধ করলেন হৈমবতী, একটু হাসতে চেষ্টা ক'রে ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'আমার আবার ভয় কি মা। আমার তো এখন যাওয়াই মঙ্গল।'

ইন্দু বলল, 'এখনই যাওয়ার কি হয়েছে।'

হৈমবতী একথার কোন জবাব দিলেন না।

ইন্দু একটু কৈফিয়তের সুরে বলল, 'এ ক'দিন আমি আসতে পারিনি—'

হৈমবতী বললেন, 'জানি মা। তোমার অশান্তির কথা আমি জানি। কি আর করবে। মেয়ে মানুষকে অনেক সহ্য করতে হয়।'

এক সঙ্গে এই ক'টি কথা বলে হৈমবতী যেন হাঁপিয়ে উঠলেন। ইন্দু তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, 'আপনার আর কথা বলে কাজ নেই। কিছু খাবেন এখন ?'

হৈমবতী বললেন, 'না। আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। তোমাকে একটা অনুরোধ করব মা।'

'বলুন।'

'এখন নয়। এখন নিজেই আমি গুরুর নাম বলতে পারি। কিন্তু যখন সে শক্তি থাকবে না তখন তুমি আমার কানে হরির নাম দিয়ো। আমার ছেলে নাস্তিক। ওকে আমি বিশ্বাস করিনে। তুমি আমার মেয়ের কাজ কোরো মা। আমাকে ভগবানের নাম শুনায়ো।'

ইন্দু ঘাড় কাত করল। এতক্ষণে ওরও যেন কথা বলবার শক্তি-টুকু গেছে। ছলছল করছে চোখ দুটি।

খানিকবাদে ব্যোমকেশবাবু এলেন। রোগিণীকে পরীক্ষা করলেন, প্রেসক্রিপসন পালটালেন। তারপরই যাওয়ার সময় ইন্দুকে একটু আড়ালে ডেকে বললেন, 'হয়ত রাত্রের মধ্যে কিছু হবে না। তবু সাবধান থাকা দরকার। আপনি এঘরে থাকতে পারলে ভালো হয়।'

ইন্দু মৃদু স্বরে বলল, 'আমি আছি।'

আরো কিছুক্ষণ পরে অনুপম ফিরে এল বাসায়। অফিসের ছুটির পর ভবানীপুরে একটি পার্টির কাছে গিয়েছিল। ভরসা ছিল হাজার তিনেক টাকার কেস পাবে। কিন্তু আজও কেবল প্রতিশ্রুতিই মিলেছে, আর কিছু মেলেনি। ইনসিওরেন্সের এজেন্টকে অমন ভুয়ো প্রতিশ্রুতি অনেকেই দেয়। ফিরে এসে স্ত্রীকে ঘরে দেখতে না পেয়ে অনুপমের মেজাজ আরো বিগড়ে গেল। ছেলেকে দিয়ে ডেকে পাঠাল স্ত্রীকে। ইন্দু এসে দাঁড়ালে চড়া গলায় বলল, 'তুমি আবার ওঘরে গেছ? লজ্জা বলে কোন জিনিসই কি তোমার মধ্যে নেই?'

ইন্দু শান্ত স্বরে বলল, 'চেঁচামেচি কোরোনা, ওঘরে চিন্ময়ের মার অবস্থা খুব খারাপ, আমার রান্নাবান্না সব হয়ে গেছে। তোমরা এবার সকাল সকাল খেয়ে নাও এসে।'

স্বামী আর ছেলে মেয়েকে পাশাপাশি ঠাঁই করে দিয়ে ইন্দু তাদের খাইয়ে দিল।

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে অনুপম বলল, 'তুমি খাবে না?'

ইন্দু বলল, 'আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবেনা, আমি পরে খাব।'

চিন্ময় মায়ের কাছে স্থিরভাবে বসেছিল। ইন্দু তার কাছে এসে কোমল স্বরে বলল, 'চল সামান্য কিছু মুখে দিয়ে নেবে।'

বলে নিজেই একটু লজ্জিত হোল ইন্দু। মা অসুস্থ হওয়ার পর থেকে চিন্ময় রোজ দু'বেলা পাইস হোটেলে খাচ্ছে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইন্দু তাকে এক'দিন খেতে বলতে পারেনি, আজ যদি চিন্ময় না করে ওকে দোষ দেওয়া যায় না।

ইন্দু আর একবার অনুরোধ করল, 'চল।'

চিন্ময় বলল, 'না কিছু খেতে আমার আর ইচ্ছা করছেনা ইন্দুদি। আপনি যান খেয়ে আসুন।'

ইন্দু চিন্ময়ের মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে কি দেখল তারপর বলল, 'আচ্ছা আর কিছু না খাও এক কাপ চা খেয়ে নেবে চল। রাত জাগতে সুবিধে হবে। আমিও খাব এসো।'

হৈমবতী ঘুমোচ্ছিলেন। দুজনে আস্তে আস্তে উঠে এল। ভাতের হাঁড়িতে জল ঢেলে দিল ইন্দু। উনুনে তখনও আগুন ছিল। তাড়াতাড়ি দু'কাপ চা ক'রে নিয়ে অনেকদিন বাদে ইন্দু ফের মুখোমুখি বসল চিন্ময়ের। এই চায়ের কাপ সামনে রেখে কতদিন কত আলোচনাই তারা করেছে। সাহিত্য নিয়ে সমাজ নিয়ে কত তর্কের ঝড় বয়ে গেছে তাদের মধ্যে। কিন্তু আজ মৃত্যুর ছায়ায় বসে দুজনেই মৌন হয়ে রইল।

একটু বাদে চিন্ময় হঠাৎ বলল, 'মা যে আজই চলে যাচ্ছেন তা নয়, অনেকদিন আগে থেকেই তিনি যেন আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। আমি তাঁকে বিদায় দিয়েছিলাম ইন্দুদি। সংসারে তিনি ছাড়া আমার তো আর কেউ নেই। তবু একঘরে থেকেও আমরা যেন ছিলাম আলাদা পৃথিবীর মানুষ। শেষের দিকে তিনি আমাকে আর বুঝতে পারতেন না, আমি তাঁকে বুঝতে চাইতুম না। তিনি আমার মনের নাগাল না পেয়ে আমার শরীরকেই বেশি করে আঁকড়ে ধরতেন। তাতে আমার আরো রাগ হোত, ঘৃণা হোত।'

চিন্ময়ের গলা ধরে এল। একটু চুপ ক'রে থেকে সে ফের বলতে লাগল, 'আজ মনে হচ্ছে-বিদ্যাই বলি আর বুদ্ধিই বলি সংসারে ভালোবাসার চেয়ে বড় কিছু আর নেই। সেই ভালোবাসার অভাবে আমি তাঁকে পেয়েও পুরোপুরি পাইনি। তাঁর কাছে থেকেও চিরকাল দূরেই রয়ে গেছি। আজ তাঁকে একেবারেই হারাচ্ছি। ফিরে পাওয়ার কোন আশাই আর রইলনা।'

কথার মধ্যে অনুপ্রাস আর পানীয়ের মধ্যে চা চিন্ময়ের বড় প্রিয়। কিন্তু ইন্দু লক্ষ্য করল আজ সেই দুটি প্রিয়বস্তুকে চিন্ময় ছুঁয়েও দেখছে না। ইন্দুর চা প্রায় শেষ হয়ে এল। কিন্তু চিন্ময়ের চায়ের কাপ তেমনি ধরাই পড়ে রয়েছে।

হঠাৎ সেই ঠাণ্ডা চায়ের কাপের মধ্যে দু'ফোঁটা উষ্ণ চোখের জল গড়িয়ে পড়ল চিন্ময়ের।

ইন্দু ওর আরো কাছে সরে এল, মৃদু আর কোমল স্বরে বলল, 'ওকি হচ্ছে চিন্ময়। তুমি না পুরুষ। তুমি না বড় হয়েছ। মা কি কারো চিরকাল থাকে।'

জলভরা ঝাপসাচোখে চিন্ময় এবার ইন্দুর দিকে তাকাল, আজও বড় সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। মাথার আধখানা আঁচলের নিচে সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা। স্মিত শান্ত মুখশ্রীতে আজ বিষাদের ছায়া পড়েছে। বাল্যে কৈশোরে দেখা সিঁদুর ভূষিত মায়ের সেই স্নিগ্ধ সুন্দর মুখকান্তি চিন্ময়ের স্মৃতিতে আজ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে মনে ভাবল ইন্দুর কথাই ঠিক, মা কারো চিরকাল থাকেনা। প্রিয়ার মধ্যে প্রিয়তমার মধ্যে সে মিশে থাকে।

দুজনে ফিরে এল হৈমবতীর ঘরে। ইন্দু তাঁর পাশে গিয়ে বসল, চিন্ময় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল তাঁর সামনে। তারপর সেই রোগজীর্ণা বৃদ্ধা মায়ের ক্লিষ্ট মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল। মনে হোল এর চেয়ে প্রিয় এর চেয়ে সুন্দর মুখ পৃথিবীতে আর নেই। ছাব্বিশ বছর ধরে এই মুখের কত রূপ আর কত রূপান্তরই না চিন্ময় দেখেছে। এই মুখের কত আশ্বাস, কত সান্ত্বনা কত ভালোবাসার কথাই না শুনেছে। মায়ের কাছ থেকে মানুষ ভাষা পায়। আর ভাব পায় বোধহয় বাপের কাছ থেকে। কিন্তু ভাব আর ভাষা

তুইই চিন্ময় মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছে। অল্প বয়সে তার বাবা মারা যান, মা-ই ছিলেন একসঙ্গে বাবা আর তার মা। ভরণপোষণ শিক্ষা দীক্ষার সব ভার তাঁর ওপর ছিল। ছেলেবেলার সেই স্নেহ আর শাসন ভরা দিনগুলির কথা চিন্ময়ের মনে পড়তে লাগল।

রাত বাড়তে লাগল।

খাওয়ার পর অনুপম বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারেনা। শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আজ কিছুতেই তার ঘুম এলনা। দুটো চোখের ভিতর যেন জ্বালা করছে। আসলে বুকের জ্বালা। ইন্দু তার উপস্থিতিতে, তাকে অগ্রাহ্য করে চিন্ময়ের ঘরে গিয়ে বসেছে। একই ঘরে একই সঙ্গে রাত জাগছে। আজ তারা মুখোমুখি বসে চা খেয়েছে কথা বলেছে, একজন আর একজনকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে। সবই লক্ষ্য করেছে অনুপম। কিছুই তার চোখ এড়ায়নি। অথচ সব দেখে সব জেনেশুনেও অনুপম কিছুই করতে পারছে না। এখন তার উচিত চুলের মুঠি ধরে ইন্দুকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে আসা, তার উচিত লাথি মেরে চিন্ময়কে বাড়ি থেকে বের ক'রে দেওয়া। তা সে পারে। সে শক্তি অনুপমের আছে। কিন্তু শক্তি থাকলেও শক্তি প্রয়োগের জো নেই। ওরা একটি মরণাপন্ন রোগীর কাছে বসে রয়েছে। সাধারণ সামাজিক ভদ্রতার জন্য এই মুহূর্তে অনুপমের কিছুই আর করবার নেই। আজকের রাতটা তাকে মরা মানুষের মত চুপ ক'রেই থাকতে হবে। যত আপত্তিকর ব্যবহারই ওরা করুক। অনুপম আজ কিছুই বলতে পারবে না। কারণ মৃত্যুর ছুতো পেয়েছে ওরা। তাকে শিখণ্ডীর মত দাঁড় করিয়েছে সামনে। অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ করতে করতে অনুপম এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। ঠিক ঘুম নয়, পাতলা তন্দ্রা। সামান্য কি একটা শব্দে সে তন্দ্রা ভেঙে গেল। পাশে তিলু আর মিনু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু

ইন্দুর জায়গা শূন্য। সে এখনো ফেরেনি। কিসের একটা তীব্র যন্ত্রণায় বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল অনুপমের। কেবল বিছানাই নয়, বুকের অনেকখানি জায়গা খালি হয়ে গেছে। সেই শূন্যতা কিছুতেই আর ভরবার নয়।

ঘরে আলো জ্বলছে। সেই আলোয় দেয়ালের পেরেকে ঝোলানো দামী হাতঘড়িটার দিকে তাকাল অনুপম। রাত সাড়ে তিনটে। ঘড়ির দুটো কাঁটা অসংখ্য কাঁটা হয়ে অনুপমের চোখে বিঁধল। সাড়ে তিনটে! এখন পর্যন্ত সে নিচে আছে। এক সঙ্গে রাত ভোর করছে। আর বোকার মত একা একা ঘুমোচ্ছে অনুপম। বিছনার ওপর তড়াক ক'রে সে উঠে দাঁড়াল। লম্বা পায়ে ডিঙিয়ে গেল ঘুমন্ত ছেলেমেয়েকে। ঘর থেকে বেরিয়ে দু'তিনটে সিঁড়ি একসঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে লাগল। আর এক মুহূর্ত নয়, আর এক মুহূর্তও নয়।

চৌকাঠের সামনে এসে অনুপম থেমে দাঁড়াল। হৈমবতীর বুকের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে চিন্ময়, আর ইন্দু চিন্ময়কে এক হাতে আলিঙ্গন ক'রে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন বলছে। চিন্ময়ের মত আত্মীয় যেন ইন্দুর পৃথিবীতে অপর কেউ নেই, চিন্ময় ছাড়া যেন আর কেউ নেই।

মুহূর্ত কাল পাহাড়ের মত স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল অনুপম। তারপর সেই পাহাড়ে আগুন জ্বলল। লাভাস্রোত বয়ে গেল আগ্নেয়গিরির।

অনুপম তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'ইন্দু উঠে এস।'

চিন্ময়ের হাত ছেড়ে দিয়ে ইন্দু বলল, 'মাসিমা চলে গেছেন।'

অনুপম বলল, 'তাতে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হয়নি। তুমি উঠে এসো।'

শোকস্তব্ধ বিমূঢ় চিন্ময়ের মুখ থেকে কোন কথা বেরুল না। ইন্দু তার দিকে একবার তাকিয়ে স্বামীর পিছনে পিছনে চলে এল।

সিঁড়ির কাছে তিলু আর মিনুর গলা শোনা গেল, 'মা, মা।'

খালি ঘরে তারা ভয় পেয়ে জেগে উঠেছে।

কিন্তু ইন্দু কোন সাড়া দিল না।

স্ত্রীকে নিজের ঘরের মধ্যে এনে দোর বন্ধ করে দিল অনুপম, তারপর তার চোখে চোখ রেখে ডাকল, 'ইন্দু।'

ইন্দুর মনে পড়ল অনেকদিন বাদে স্বামী আবার তাকে নাম ধরে ডাকতে শুরু করেছে। বিয়ের পর প্রথম প্রথম গুরুজনদের আড়ালে অনুপম ইন্দুর নাম ধরে ডাকত। ডেকেই কেমন যেন লজ্জিত হয়ে পড়ত। মাঝে মাঝে বলত, 'শরদিন্দুনিভাননা।' বলত আর হাসত। ঠাকুরদার দেওয়া এই ছিল ইন্দুর পুরো নাম, সে নাম ছোট হতে হতে হোল ইন্দুলেখা পরে লেখাটুকু মুছল। ছেলেমেয়েরা একটু বড় হওয়ায় ইদানিং নাম ধরে আর স্ত্রীকে বড় একটা ডাকে না অনুপম। আজ ফের ডাকল। কিন্তু কিসের একটা অস্বস্তি আছে যেন এই ডাকের মধ্যে, রাজ্যের ঘৃণা যেন এই দুটি অক্ষরের ধ্বনিটুকুর মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে।

অনুপম আর একবার ডাকল, 'ইন্দু।'

ইন্দু বলল, 'বল।'

'তুমি কেন ওকে ছুঁয়ে ছিলে, কেন ওকে ধরে ছিলে।'

'এসব কথার তুমি কি আর দিন পেলে না! একজন লোক পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেল। তোমার তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। তুমি এখনও ওই কথাই বলছ। তুমি মৃত্যুকে অপমান করছ!'

ইন্দুর দু'চোখ থেকে, তার কণ্ঠ থেকেও আজ যেন ঘৃণা ঝরতে লাগল।

অনুপম দাঁতে দাঁত ঘষল। 'মরা মানুষকে অপমান করলাম। ফের সেই নভেলী ঢং! মৃত্যুর আবার মান অপমান কি? কিন্তু

তুমি যে দিনের পর দিন একটা তাজা জীবন্ত লোককে অপমান করে চলেছ তার কি হবে, সে শাস্তি তুমি এড়াবে কি করে?' বলতে বলতে ইন্দুর ডান হাতখানা নিজের কঠিন মুঠির মধ্যে চেপে ধরে একটা মোচড় দিয়ে অনুপম ফের জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলে এড়াবে?'

দুঃসহ যন্ত্রনায় ইন্দু আর্তনাদ করে উঠতেই সঙ্গে সঙ্গে হাত ছেড়ে দিল অনুপম। ইন্দু মেঝেয় বসে পড়ল।

আর সব কাজের মত শবদাহের ব্যাপারেও অনুপমের দক্ষতা আছে। মনে যতই অশান্তি থাকুক না, এসব সামাজিক কর্তব্যে তার কোন ত্রুটি হয় না। অল্প সময়ের মধ্যেই সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। হৈমবতীর শব নিয়ে শ্মশান বন্ধুরা এগিয়ে চললেন। যন্ত্রের মত চিন্ময় চলল সঙ্গে।

একটু বেলা হলে দোর খোলা পেয়ে তিলু আর মিনু ঢুকল ভিতরে।

তিলু বলল, 'ওকি মা কি হল তোমার?'

মিনু কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'মার হাত ভেঙ্গে গেছে দাদা।'

ইন্দু ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসেছে। ম্লান হেসে বলল, 'না, না কিছু হয়নি। তোমরা যাও ওঘরে।'

তিলু পাশের ঘরে গেল না। পাশের বাড়ির বন্ধুর দিদির কাছ থেকে আয়োডেক্স চেয়ে নিয়ে এসে বলল, 'তোমার হাত দাও মা, লাগিয়ে দিচ্ছি, এক্ষুণি সেরে যাবে।' মায়ের কোন মানা শুনল না। আঙুল দিয়ে তিলু মায়ের হাতে আয়োডেক্স ঘষে দিতে লাগল।

অনুপম ভেবেছিল পরদিনই চিন্ময়কে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলবে। মেয়েছেলে আর তো কেউ রইলনা। এখন একা একা এই গৃহস্থের

বাড়িতে ও কি ক'রে থাকবে। এবার ও ঘর ছেড়ে দিয়ে কোন মেসে টেসে গিয়ে উঠুক। এমাসের ভাড়াটা অনুপম না হয় ছেড়ে দেবে। কিন্তু বলতে গিয়ে দোরের কাছে থেমে দাঁড়াল অনুপম। দরজা খোলাই ছিল। তবু ঘরে ঢুকতে পারলনা। দেখল দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে চিন্ময় পাথরের মূর্তির মত বসে আছে। ওর চুলগুলি উস্কো খুস্কো। ঘরময় বই আর কাগজপত্র ছড়ানো রয়েছে। যেন এখনো শ্মশানের মধ্যে বসে আছে চিন্ময়। মনে মনে ভারি মায়া হোলো অনুপমের। তার বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠল। এই মুহূর্তে সে ভুলে গেল চিন্ময় তার শত্রু, চিন্ময় তার প্রতিদ্বন্দ্বী। পনের ষোল বছর আগের মাতৃশোকাতুর আর একটি যুবকের কথা মনে পড়ে গেল অনুপমের। চব্বিশ বছর বয়সে সে নিজেও মাকে হারিয়েছিল। হারিয়ে চিন্ময়ের মত অমন ধীর স্থির ভাবে বসে থাকতে পারেনি। তখন অনুপম ছিল গাঁয়ের বাড়িতে। বর্ষাকাল। বাড়ির চারদিকে জল থৈ থৈ করত। সেই দ্বীপ থেকে হাঁটা পথে কোথাও বেরোবার জো ছিলনা। কিন্তু ঘাটে ডিঙি বাঁধা থাকত। বৈঠা আর সেই ডিঙি নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ত অনুপম। খাল পার হয়ে নদী, নদী পার হয়ে মাঠ। জলভরা শস্যভরা মাঠের এক ধারে নৌকা থামিয়ে মায়ের শোকে চোখের জল ফেলত অনুপম। আস্তে আস্তে সূর্য অস্ত যেত, সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসত, তার আগে কিছুতেই বাড়ি ফিরতো না।

ফিরে এলে পিসীমা রাগ করতেন, 'বেড়াতেই যদি যাবি, একা একা যাস কেন। বন্ধু-বান্ধব কি চাকর-বাকর কাউকে নিয়ে যা। গুরু-দশার সময় একা একা ঘোরা কি ভালো।'

'কেন তাতে কি হয় পিসীমা?'

'কি আবার হবে। দোষ হয়। সে কি এত অল্পেই মায়া কাটাতে পারে। মায়া কাটানো কি এত সহজ। সে বহুকাল পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে

ঘুরে বেড়াবে টেনে নেওয়ার জন্যে ছল ছুতো খুঁজবে। খবরদার আর কখনো একা একা বেরোবিনে।'

হাতেবাঁধা রক্ষাকবচটা ঠিক আছে কিনা, গায়ের চাদরে লোহার চাবিটা বাঁধা আছে না খসে পড়ে গেছে অশৌচের একমাস রোজ পরীক্ষা ক'রে দেখতেন পিসীমা। সেই মাও নেই, পিসীমাও নেই। তাঁদের কথা ভেবে মনটা ভারি উদাস হয়ে গেল অনুপমের। চিন্ময়ের শোকস্তব্ধতা না ভেঙে ফিরে চলে এল। একবার ভাবল ওকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে আসে। কিন্তু পারল না। ওর সঙ্গে কথা বলতে কেমন যেন একটু লজ্জা হোল অনুপমের। নিজের জন্যে নয়, চিন্ময়ের জন্যে, চিন্ময়ের অপরাধের জন্যেই লজ্জা। অনুপমের স্ত্রীকে যে কুনজরে দেখেছে তার সঙ্গে কি ক'রে কথা বলতে পারে অনুপম। বলতে গেলে কটুকথা বলতে হয়, গালাগাল দিতে হয়, মারধোর করতে হয়। যাকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে তার সঙ্গে কিছুতেই ভদ্রতা করতে পারেনা অনুপম। সে খেলোয়াড়ের জাত। তার মন আর মুখ ভিন্ন নয়। বেশতো ছিল চিন্ময়। অনুপম তো তাকে আদর করেই বাড়িতে ডেকেছিল। ওকে স্নেহ করেছিল ছোট ভাইয়ের মত। তবু কেন চিন্ময় অমন আহাম্মুকি করতে গেল। সংসারে কি মেয়ের অভাব আছে। টুলিকে পছন্দ না হোত কলেজে পড়া আর কোন মেয়েকে বিয়ে ক'রে ভালোবাসত, না হয় ভালোবেসে বিয়ে করতে পারত চিন্ময়। তাতেও কোন দোষ ছিল না। কিন্তু এমন মহা অপরাধ করতে গেল কেন? কিসের আশায়? যার স্বামী আছে, সন্তান আছে, তার কাছ থেকে লুকোচুরি ক'রে কতটুকুই বা পেতে পারে চিন্ময়? পরস্ত্রীর সেই দু'চার ফোঁটা ভালোবাসার দাম কি এতই বেশি যার জন্যে নিজের মান-সম্মান, অন্যের সুখ-শান্তি নিয়ে এমন জুয়ো খেলতে গেল চিন্ময়? যে অনুপম দাদার মত, বন্ধুর মত তাকে ভালো-

বেসেছে কিসের জন্যে সেই স্নেহ আর বিশ্বাস চিন্ময় হারাতে গেল? পুরুষ পুরুষকে যে সম্মান দেয়, শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে তার কাছে কি কোন মেয়েলি প্রেমের তুলনা হয়? অনুপম নিজে হ'লে কিছুতেই অমন ভুল করত না, চিন্ময়ের মত অমন বে-আক্কেল আর আহাম্মক হোত না সে।

রান্নাঘরের সামনে বসে ইন্দু বঁটি পেতে তরকারি কুটছিল অনুপম এসে সেখানে দাঁড়াল, স্ত্রীকে ডেকে বলল, 'শোন।'

ইন্দু মুখ না তুলেই জবাব দিল, 'বল।'

অনুপম বলল, 'চিন্ময় যদি চায় অশৌচের মাসটা থেকে যেতে পারে। আমি নিরঞ্জনকে কোন রকমে বলে কয়ে রাখব। কিন্তু এক মাস পরে ঘর তাকে অবশ্যই ছেড়ে দিতে হবে।'

ইন্দু বলল, 'বেশতো তাকে বলে দাও।'

অনুপম একটু হাসল, 'তুমিই বলে দিয়ো। কথাবার্তা যখন ফের শুরু করেছ তখন আর লজ্জা কি।'

ইন্দু কোন জবাব দিল না।

খানিক বাদে নাওয়া খাওয়া সেরে অনুপম অফিসে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে বলল, 'হাতে কি খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?'

ইন্দু বলল, 'না।'

মিনু জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, মার হাত ভাঙল কি করে?'

অনুপম জবাব দিল, 'পা পিছলে আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিল জানিসনে বুঝি।' তারপর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল, 'সন্ধ্যার পর এসে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাবো।'

ইন্দু বলল, 'কোন দরকার নেই।'

খানিকক্ষণ কি চিন্তা করল ইন্দু তারপর ঠিক করল চিন্ময়কে আজই সে বলে দেবে। এখান থেকে চলে যেতে বলে দেবে। এখানে যত বেশি

সে থাকবে তত অশান্তি বাড়বে। তার আর এখানে থেকে কাজ নেই।

কাজকর্ম সেরে চিন্ময়ের ঘরের সামনে এগোতেই তার কাণ্ড দেখে ইন্দু অবাক হয়ে গেল। চিন্ময় জানলার সামনে ছোট আয়নাখানা নামিয়ে সেভিংস বাক্স খুলে ক্ষৌরী হতে বসেছে। গালে কেবল সাবান মাখতে শুরু করেছে এখনো ক্ষুর ধরেনি।

যেন সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে ইন্দু তেমনি দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকে চিন্ময়ের সামনে থেকে শেভ করার সরঞ্জামগুলি ছিনিয়ে নিয়ে বলল, 'একি হচ্ছে চিন্ময়? তোমার না অশৌচ, গুরুদশা?'

ইন্দুর এই ব্যস্ততায় চিন্ময় একটু অবাক হয়ে থেকে বলল, 'তাতে কি হয়েছে। শোক তো আমার ভিতরে। একটু বাইরে বেরোতে হবে। এমন অপরিচ্ছন্ন ভাবে বেরিয়ে কি লাভ।'

ইন্দু বলল, 'লাভ লোকসান কিছু বুঝিনে। আমি যতক্ষণ আছি, তোমাকে এসব অনাচার করতে দেব না। তুমি কি হবিষ্য টবিষ্য কিছুই করবে না? শ্রাদ্ধ-শান্তি সব বাদ দেবে?'

চিন্ময় বলল, 'তাইতো ভেবেছি।'

ইন্দু বলল, 'ওসব ভাবনা ছাড়। ধর্ম না মানো, সমাজ তো মানো।'

চিন্ময় একটু হাসল, 'আমাকে তো জানেন। আমি শুধু অধার্মিক নই, অসামাজিকও। যে দু'চারজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমার সমাজ তারা এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না।'

ইন্দু বলল, 'কিন্তু তারা ছাড়া কি আর কেউ নেই?'

চিন্ময় বলল, 'আর একজন অবশ্য আছেন।'

আরক্ত মুখে ইন্দু চোখ নামিয়ে নিল। কিন্তু পরক্ষণে সমস্ত দ্বিধা-সংকোচ ত্যাগ করে মুখ তুলে বলল, 'বেশ, সে আছে বলে যদি স্বীকার কর, তাহ'লে তার কথাও তোমায় শুনতে হবে।'

চিন্ময় বড় বিব্রত বোধ করল। ইন্দুর সঙ্গে তার কেবল হৃদয়ধর্মে মিল। বিচারবুদ্ধিতে রুচিপ্রবৃত্তিতে কোন মিল নেই। তবু সেকথা বলতে চিন্ময়ের বাধল। যে নারী শত লাঞ্ছনা গঞ্জনা, শাসন তিরস্কার সত্ত্বেও তার কাছে আসতে পেরেছে, স্বামীর সমস্ত ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে পরম বিপদের দিনে তার পাশে এসে দাঁড়াতে পেরেছে তাকে আঘাত দিতে চিন্ময়ের মন সরল না। আচারবিচারের তর্ক এই মুহূর্তে নেহাৎই তার কাছে বাইরের বস্তু মনে হোল। ওসব মানা না মানা একই কথা। কিন্তু ইন্দুর খুসি হওয়া না হওয়া চিন্ময়ের কাছে এক কথা নয়।

ইন্দু বলল, 'অত ভাবছ কেন। বেশ, নিজের জন্য ওসব মানতে যদি তোমার লজ্জা হয়, আমার জন্যই মানো। তোমার মাও দু'বার ক'রে মারা যাবেন না, আমিও দু'বার ক'রে তোমাকে এসবের জন্য অনুরোধ করব না। শুধু একটিবার। তোমার কোন অসুবিধে হবে না। একটা তো মোটে মাস। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।'

চিন্ময় বলল, 'আচ্ছা।'

ইন্দু চলে যাচ্ছিল, চিন্ময় তাকে ফের ডাকল, 'আপনার হাতে ও কি হয়েছে?'

হাতখানা এবার বেশ খানিকটা ফুলে উঠেছে, যন্ত্রণাও হয়েছে খুব। তবু তাই নিয়ে কাজকর্ম করে যাচ্ছে ইন্দু। চিন্ময়ের কৌতূহল দেখে হাতখানা সে তাড়াতাড়ি আঁচলের তলায় লুকিয়ে ফেলল, 'ও কিছুনা, একটা চোট লেগেছে।'

চিন্ময় একটুকাল ইন্দুর দিকে তাকিয়ে রইল, কি একটা কথা ফের জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ইন্দুর বিব্রত ভাব দেখে থেমে গেল।

একটু বাদেই ঘর থেকে চলে গেল ইন্দু।

তার কথা বলবার ধরণে, চোখ সরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার ভঙ্গিতে চিন্ময়ের বুঝতে বাকি রইল না ইন্দু তার কাছে সত্য কথা বলেনি, সব কথা বলেনি, তার হাতে চোট লাগার পিছনে এক গোপন অকথিত কাহিনী রয়ে গেছে। কিন্তু ইন্দু যদি তার কাছে সব কথা খুলে না বলে চিন্ময় কি করতে পারে। মনে মনে ভারি অভিমান হোল চিন্ময়ের। ইন্দু কেন তাকে সব বলেনা। কই চিন্ময় তো কোন কথা তার কাছে গোপন করেনি। নিজের ভালো লাগা মন্দ লাগা রুচিপ্রবৃত্তি আশাআকাঙ্ক্ষার সব কিছুই তো ইন্দুর কাছে সে প্রকাশ করেছে। তবু ইন্দু কেন নিজেকে এমন সরিয়ে রাখে, দূরে রাখে। কেন চিন্ময়কে তার সুখ দুঃখের সমভাগী করেনা।

পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে চিন্ময় এবার বেরোবার উদ্যোগ করল। বারান্দায় নামতেই দোরভেজানো হৈমবতীর ঘরখানার দিকে চোখ পড়ল চিন্ময়ের। বুকের ভিতরটা কি একটা দুঃসহ যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠল। নতুন ক'রে মনে পড়ল মা নেই। আস্তে আস্তে দোর ঠেলে ঘরে ঢুকল চিন্ময়। ঘর শূন্য। ঠিক শূন্য নয়। হৈমবতীর ব্যবহার্য সব জিনিসই পড়ে রয়েছে। তাঁর জলের ঘটি, জপের মালা, দড়িতে ঝুলানো থান কাপড়, শাদা সেমিজ, বাসন-কোসন, সংসারের আসবাব-পত্র সবই পড়ে রয়েছে, শুধু মা-ই নেই। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ ভারি শূন্যতা বোধ করল চিন্ময়। অবরুদ্ধ কান্না যেন ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইল। অথচ এই একটু আগেও মায়ের কথা সে সম্পূর্ণ ভুলে ছিল। মা যে নেই তার জন্য চিন্ময় কোন অভাব বোধই করেনি। সে বরং ইন্দুর সঙ্গে কথা বলেছে, তাকে সুখ দুঃখের অংশ দেয়না বলে

অভিমান করেছে, আঘাত পেয়েছে, কিন্তু মা যে নেই সেই পরম দুঃখের কথা তার মনে হয়নি। সেকথা ভেবে চিন্ময় ভারি লজ্জা বোধ করল। ছি ছি ছি, চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি এরই মধ্যে এত বড় দুঃখকে সে ভুলল কি ক'রে? ইন্দু কে যে সে চিন্ময়ের মার স্মৃতিকে আড়াল ক'রে রাখে, পবিত্র শোককে ঢেকে দেয়? না, চিন্ময় মাকে ভুলবেনা, দেহকে দুঃখ দিয়ে, কষ্ট দিয়ে, অশৌচ পালনের কৃচ্ছ্র সাধনের ভিতর দিয়ে মাকে সে মনে রাখবে, মাকে সে প্রতি মুহূর্তে মনে করবে। এই স্মরণশ্রাদ্ধ ছাড়া আর কোন শ্রাদ্ধ সে মানে না, আর কোন অনুষ্ঠানের তার প্রয়োজন নেই।

দোর ভেজিয়ে রেখে চিন্ময় আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়ল। বাগবাজার পোষ্ট-অফিসে ঢুকে সেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েই কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাছে সপ্তাহ খানেকের ছুটি চেয়ে দরখাস্ত পাঠাল। ছুটি চিন্ময়ের পাওনাই আছে। দরকার হ'লে পরে আরো নিতে পারবে।

পোষ্ট-অফিস থেকে বেরিয়ে চিন্ময় গঙ্গার ধার দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াল। জোর ক'রে অন্য সব চিন্তা বাদ দিয়ে মার কথা ভাবল। বলতে গেলে সারাজীবনই তো মার সঙ্গে জড়িয়ে আছে চিন্ময়। মার স্মৃতি মানে চিন্ময়েরই অতীত ইতিহাস। বাল্য-কৈশোরের সে অতীত শুধু মুখর অতীত নয়, মধুর অতীত।

বাসায় যখন ফিরল, তখন দেড়টা বেজে গেছে। ইন্দু উদ্বিগ্নভাবে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে। চিন্ময়কে দেখে সে মৃদু তিরস্কারের স্বরে বলল, 'কি কাণ্ড বলতো, কোথায় ছিলে? আমি কতক্ষণ ধ'রে সব গুছিয়ে টুছিয়ে তোমার জন্যে বসে আছি।'

শেষ কথাটুকু ভারি মধুর লাগল চিন্ময়ের কানে। 'তোমার জন্যে বসে আছি'। তার সমস্ত দুঃখ সমস্ত শোকের ওপর যেন স্নিগ্ধ শ্বেত-

চন্দনের প্রলেপ পড়ল। চিন্ময় চোখ তুলে চেয়ে দেখল চন্দনের স্নিগ্ধতা ইন্দুর মধ্যে। আজও ওর পরণে ধোয়া চওড়া লালপেড়ে শাড়ি। মাথায় আঁচল নেই। ঘন কালো মসৃণ ভিজে চুলের রাশে পিঠ ঢেকেছে। মুখখানা একটু শুকনো শুকনো।

ইন্দু বলল, 'চল, আর দাঁড়িয়ে কাজ নেই, তাড়াতাড়ি চান সেরে নাও।'

চিন্ময় সহানুভূতির সুরে বলল, 'আপনার বোধ হয় এখনও খাওয়া হয়নি।'

ইন্দু মৃদু হেসে বলল, 'সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি এর আগে কবেই বা খাই।'

ইন্দুর পাশ দিয়ে যেতে যেতে চিন্ময়ের মনে হোল চন্দনের স্নিগ্ধতা শুধু ওর অঙ্গে নয়, হৃদয়ে। সেখান থেকেই সিত চন্দনের সুরভি উঠে আসছে। ধূপ আর চন্দন যার নিজের মধ্যে এমন পূজারিণীকে সঙ্গে পেলে চিন্ময় চিরজীবনের জন্যে পৌত্তলিক হয়ে যেতে পারে।

হৈমবতীর রান্নাঘরে ওর জন্যে হবিষ্যের উপকরণ গুছিয়ে রেখেছিল ইন্দু। স্নান সেরে চিন্ময় খেতে বসল। ঘি, আলুভাতে আর আতপ চালের ভাত। সামনে বসে হাওয়া ক'রে আস্তে আস্তে পরিবেশন করতে লাগল ইন্দু।

খেতে খেতে চিন্ময়ের মনে পড়ল গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটু আগে সে নিজের কাছে নিজে প্রশ্ন করেছিল, ইন্দু কে? তখন জবাব পায়নি এখন পাচ্ছে। ইন্দু জীবন, ইন্দু জীবনের প্রতীক। মৃত্যুকে তো সে আড়াল ক'রে দাঁড়াবেই, তাইতো তার ধর্ম। সে শূন্যতাকে ভরে তোলে, ক্ষুধাকে তৃপ্ত করে—ইন্দু অন্নদা, প্রাণদা, ইন্দু চিন্ময়ী আনন্দময়ী। চিন্ময়ী, চিন্ময়ী। কথাটা অস্ফুটভাবে বার দুই উচ্চারণ করল চিন্ময়। বড় ভাল লাগছে বলতে, ভালো লাগছে ভাবতে।

ইন্দু মৃদু হেসে বলল, 'ওকি, মনে মনে মন্ত্র পড়ছ নাকি?'

চিন্ময় বলল, 'হ্যাঁ, মন্ত্র তো মনে মনেই পড়তে হয়।'

ইন্দু কি জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু জবাব দেওয়া হোল না। পিছনে আর একজনের হাসির শব্দে চমকে উঠে ফিরে তাকাল।

'বাঃ বেশ, বেশ। সস্ত্রীক ধর্মমাচরেৎ। একি তাই হচ্ছে নাকি চিন্ময়।'

অনুপম হেসে উঠল। যেন তপ্ত তরল সিসা কানে ঢেলে দিল দু'জনের।

আজ শনিবার। দেড়টায় ছুটি হয়ে গেছে অনুপমের। কারো সে খেয়াল ছিলনা।

চিন্ময় ভাতের থালা ঠেলে রেখে উঠে দাঁড়াল। ইন্দুও বাইরে চলে এসে হাত ধুয়ে ফেলল। তারপর বাথরুমের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ইন্দু স্বামীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি শুরু করেছ বলতো। দিনান্তে একজনের খাওয়াটা অমন ক'রে নষ্ট ক'রে দিলে।'

অনুপম বলল, 'প্রাণে খুব লেগেছে, না? আর তুমি যে আর একজনের সমস্ত জীবনটা নষ্ট ক'রে দিলে, সে কিছু নয়?'

এ ধরণের প্রশ্ন স্বামীর মুখে হাজার বার শুনেছে ইন্দু। আগে অনেকবার অনেকরকম ক'রে জবাব দিয়েছে। আজ দিলনা। নিঃশব্দে ওপরে উঠে গেল।

স্ত্রীর স্পর্ধা দেখে জ্বলতে লাগল অনুপম। অথচ আশ্চর্য, অফিসে বসে একটু আগে সে নিজেই ভেবেছে ইন্দুকে বলবে চিন্ময়ের হবিষ্যের ব্যবস্থাটা যেন তাদের ঘরেই করে। ওতো নিজে রাঁধতে জানে না, কাজ কি এই গুরুদশার সময় হোটেলে টোটেলে খেয়ে। অনুপম সে কথা আজই বলত, এখনই বলত। কিন্তু ইন্দুর সেই সবুরটুকু পর্যন্ত সইল না, স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার একটু সময় কি ইচ্ছা

তার হোল না, পাছে অনুপম আপত্তি করে, সেই ভয়ে ইন্দু নিজেই সব ব্যবস্থা ক'রে বসল। চিন্ময়ের সঙ্গে এতই তার অন্তরঙ্গতা, এত তার প্রাণের টান! কিন্তু অনুপম যদি সম্মতি না দেয় ইন্দুর কতটুকু সাধ্য আছে? কতটুকু সাধ্য আছে তার নিজের ইচ্ছামত চলবার ফেরবার, এখান থেকে ওখানে নড়ে বসবার। সাধ্য যে নেই সেই কথা জোর গলায় ঘোষণা ক'রে দেওয়ার জন্যে অনুপম দোতলায় উঠে গেল।

ইন্দু জানলার শিক ধ'রে প্রায় দেওয়ালের সঙ্গে মিশে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল, অনুপম তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'শোন।'

ইন্দু মুখ না ফিরিয়ে বলল, 'বল।'

অনুপম জোর গলায় হুকুমের ভঙ্গিতে বলল, 'শোন আমার দিকে ফিরে চাও।'

ইন্দু এবার স্বামীর দিকে ফিরে তাকাল। নির্ভীক, স্থির, শান্ত তার দৃষ্টি।

অনুপম বলল, 'তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হচ্ছি। এত স্পর্ধা তোমার কোত্থেকে হোলো।'

ইন্দু কোন জবাব দিল না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

অনুপম অবাক হোলো। ওই তো চিকন কাঁচা বাঁশের মত চেহারা। ওকে অনুপম এই মুহূর্তে মট করে ভেঙে ফেলতে পারে। অনুপমের সামনে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস ওর কোত্থেকে এল। কই, আগে তো এমন পারত না।

অনুপম এবার গলা নামিয়ে শান্তভাবে বলল, 'আচ্ছা ইন্দু, লজ্জা তুমি অনেকদিন আগেই বিসর্জন দিয়েছ। কিন্তু তোমার প্রাণভয়ও কি নেই?'

ইন্দু বলল, 'না, তাও নেই। কাল তোমার হাতের মার খেয়ে আমার সেই ভয়ও ভেঙেছে।'

অনুপম দুঃখের সঙ্গে বলল, 'মার? ওই সামান্য একটু হাত মোচড়ানোকে তুমি মার বলো।'

ইন্দু এবার একটু হাসল, 'ভুল হয়েছে। বোধহয় আদর বলাই উচিত ছিল।'

ওর হাসি দেখে অনুপমের ফের রাগ চড়ে গেল। অধীরভাবে চড়াগলায় বলল, 'তুমি হাসছ! এত সব কাণ্ডের পরেও তুমি হাসতে পারছ! এত রস তোমার মধ্যে!'

ইন্দু শান্তভাবে স্বীকার করে বলল, 'হ্যাঁ রসতো আছেই।'

অনুপম পরম নৈরাশ্য, পরম ক্ষোভের সঙ্গে বলল, 'আছে কিন্তু সে রস আমার জন্যে না। অন্যের ভোগের জন্যে। কিন্তু তুমি যা ভেবেছ, তাও হবে না ইন্দু। আমি নিজে যা পাব না আমি তা কাউকে ভোগ করতেও দেবো না।' অনুপম দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'তোমার সব রস আমি নিংড়ে নিংড়ে বের করব। তারপর আমি তা রাস্তার ধুলোয় ঢালব নর্দমায় ঢালব তবু তা অন্য কাউকে ভোগ করতে দেব না। আমাকে তুমি তেমন পুরুষ পাওনি।'

সিঁড়িতে লঘু চঞ্চল পায়ের শব্দ শোনা গেল। বইখাতা বগলে তিলক স্কুল থেকে ফিরে এসেছে। ইন্দু তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে গেল, 'তোর অত দেরি হোল কেন রে তিলু।'

অনুপমও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ তোর অত দেরি হোলো কেন।'

তিলক দুজনের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, 'ছুটির পরে নতুন মাষ্টার মশাই আমাদের ম্যাজিক দেখাচ্ছিলেন বাবা, কি চমৎকার ম্যাজিক মা, তুমি যদি দেখতে!'

অনুপম স্থির করল আর এক মুহূর্তও চিন্ময়কে সে এ বাড়িতে থাকতে দেবে না। নোটিশ তো অনুপম আগেই দিয়েছে। এবার চিন্ময় ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে যাক। অনেক সহ্য করেছে অনুপম। অনেক উদারতা দেখিয়েছে। তার ফল এই দাঁড়িয়েছে। আর এক মুহূর্তও নয়। ওর মত লম্পট বদমায়েসের আবার গুরুদশা কি?

নিচে নেমে এসে অনুপম চিন্ময়ের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'তুমি তাহলে আজই বিকালে চলে যাচ্ছ।'

চিন্ময় ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে ছিল। অনুপমের সাড়া পেয়ে দোরের কাছে এগিয়ে এসে দৃঢ়স্বরে বলল, 'না আমি যাচ্ছি না।' ,

অনুপম তার স্পর্ধা দেখে বিস্মিত হয়ে বলল, 'যাচ্ছি না মানে? এখানে তুমি একা একা আর থাকবে কি করে? কোন মেয়ে-ছেলে নেই—'

চিন্ময় বলল, 'আছেন।'

অনুপম তীক্ষ্ণস্বরে বলল, 'কার কথা বলছ তুমি?'

চিন্ময় বলল, 'কালীঘাটে আমার এক মাসীমা আছেন, তিনি এসে থাকবেন এখানে।'

অনুপম বলল, 'না, তাহলেও তোমাদের এখানে আর থাকা চলবে না। আজই তোমার এ ঘর দুখানা ভ্যাকেন্ট করে দিতে হবে। আমি নিরঞ্জনকে কথা দিয়েছি। তুমি একা মানুষ, কোন মেসে গিয়েও আপাতত থাকতে পারবে।'

কলতলায় কি যেন কাজ করছে ইন্দু। চিন্ময় যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে তাকে। তাদের কথাবার্তাও যে ইন্দু সব শুনতে পাচ্ছে তাতে চিন্ময়ের কোন সন্দেহ রইল না।

চিন্ময় বলল, 'আমি উকিলের কাছে গিয়েছিলাম। আপনার

নোটিশের জবাব তার কাছ থেকেই পাবেন। ঘর আমি ছাড়ব না।'

অনুপম কিছুক্ষণ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চিন্ময়ের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'নিশ্চয়ই ছাড়বে। তোমাকে ছাড়াতে আমার উকিল মোক্তার, থানা পুলিসের দরকার হবে না। তোমাকে বের করে দিতে আমি একাই পারব। বেশ, আরো চব্বিশ ঘণ্টা সময় তোমাকে দিলাম। কিন্তু কাল যেন আমি ঘর খালি পাই।'

অনুপম বেরিয়ে গেল।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইন্দু সব কথাই শুনছিল। লজ্জায় সে তাকাতে পারছিল না কারো দিকে। আচ্ছা সব পুরুষই কি সমান? চিন্ময়ও এত গোঁয়ার হোল কি করে? ও কোন জোরে লড়তে চায়? কোন জোরে ও পারবে অনুপমের সঙ্গে? গায়ের জোরে নয় আইনের জোরেও নয়। সমাজ-সংসার রীতি-নীতি আইন-কানুন সবই তো অনুপমের পক্ষে। তবু এত সাহস এত জোর ওর হোল কোত্থেকে? ও কি ইন্দুর ভরসা করছে নাকি? সব কিছু একদিকে আর ইন্দু অন্যদিকে? ও কি তাই ভেবেছে? ছি ছি ছি। ইন্দু তা কি করে পারবে। কিন্তু সবাই যদি ওর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, আর ও যদি ইন্দুর ওপর নির্ভর করেই থাকে তাহলে ইন্দু ওর পক্ষ না নিয়েই বা পারবে কি করে? ওর মা যে বলে গেছেন ওকে দেখতে। কিন্তু সব বাঁচিয়ে সবদিক দিয়ে ওকে কি করে দেখবে। তার অত শক্তি কোথায়, অত সাধ্য কই? চিন্ময়ের জন্য বড় দুর্ভাবনা হোল ইন্দুর মনে।

সারাদিন ভাবল ইন্দু, সারারাত ভাবল। ভাবনার আর শেষ নেই।

পরদিন অনুপম অফিসে বেরিয়ে গেলে ইন্দু আস্তে আস্তে

চিন্ময়ের ঘরের দিকে চলল। চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করল, দ্বিধা হোল, বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করল বুঝি একটু। তারপর আর দেরি না করে ঢুকে পড়ল ওর ঘরের মধ্যে।

চিন্ময় তখনও চুপ করে বসে ছিল। হঠাৎ ইন্দুকে এমন অতর্কিত-ভাবে আসতে দেখে চিন্ময় এগিয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়াল। তারপর ইন্দুর দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'কিছু বলবেন?'

ইন্দু আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি চলে যাও।'

চিন্ময় বলল, 'চলে যাব? কেন?'

ইন্দু একটু হাসবার চেষ্টা করল, 'আবার বলে কেন! কিন্তু এখানে থেকেই বা তোমার কি হবে।'

চিন্ময় সোজা ইন্দুর দিকে তাকাল, 'কি হবে তা জানিনে। কিন্তু এখানে আমাকে থাকতে হবে।'

ইন্দু বলল, 'থাকতেই হবে।'

চিন্ময় বলল, 'হ্যাঁ, কোথাও না কোথাও থাকতে যখন হবেই, এখানেই বা কেন নয়?'

ইন্দু বলল, 'কিন্তু তার পরিণাম জানো?'

চিন্ময় বলল, 'জানি। অনুপমদা এই খানিকক্ষণ আগেও শাসিয়ে গেছেন। কিন্তু আইন-আদালত তো কেবল তাঁর জন্যই খোলা নেই। তা আমিও করতে জানি।'

ইন্দু একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'ছিঃ ও সবের মধ্যে যেয়ো না। তাতে কারোরই মান থাকবে না। তার চেয়ে তুমি চলে যাও চিন্ময়, সেই ভালো।'

চিন্ময় ইন্দুর আরো কাছে এগিয়ে এল, বলল, 'তুমিও আমাকে চলে যেতে বলছ।'

'তুমি' কথাটা কানে একটু লাগল ইন্দুর। কিন্তু কোন প্রতিবাদ না ক'রে, চিন্ময়কে কোন বাধা না দিয়ে সে আস্তে আস্তে বলল, 'হ্যাঁ, তাই বলছি।'

চিন্ময় হঠাৎ ইন্দুর হাতখানা শক্ত ক'রে চেপে ধরল, 'আমি যদি যাই, আমি তোমাকেও নিয়ে যাব ইন্দু, আমি একা যাব না।'

ইন্দু মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইল, স্পন্দন যেন থেমে গেল হৃদপিণ্ডের। এ যেন সেই লাজুক ভীরু চিন্ময় নয়, এ যেন অন্য মানুষ, অন্য পুরুষ।

একটু বাদে আস্তে আস্তে হেসে বলল 'ছেড়ে দাও, হাতে বড় লাগছে। ওই হাতটাই ভেঙ্গে গেছে আমার।'

চিন্ময় এবার ইন্দুর ফুলেওঠা হাতখানার দিকে তাকিয়ে একটু অপ্রতিভ হোল, মুঠি শিথিল করল, কিন্তু হাতখানা একেবারে ছেড়ে দিল না।

বেশ একটু বিদ্বেষের সুরে চিন্ময় বলল, 'ভেঙে গেছে বোলো না, ভেঙে দিয়েছে বলো। আমি সব জানি।'

ইন্দু বলল, 'তা'হলে তো জানোই।'

চিন্ময় কোমল বেদনার্ত কণ্ঠে ডাকল, 'ইন্দু।'

ক'দিন ধরে নিজের নাম সে নতুন ক'রে স্বামীর মুখে শুনছে। আজ আবার আর একজনের মুখে শুনতে পেল। দুজনের মুখে ওই একই নামের উচ্চারণ একেক রকম, ধ্বনি আলাদা, মানে আলাদা। সেই আহ্বানে ইন্দুর হৃদয়ের সবগুলি তার যেন একসঙ্গে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। সেই ঝঙ্কারের তীব্রতায় ইন্দুর মনে হোলো বুঝি সব ছিঁড়ে যাবে, আজ বুঝি সব ছিঁড়ে যাবে।

কিন্তু পরমুহূর্তে নিজের আবেগকে সংযত ক'রে ইন্দু স্থির, সহজ-ভাবে দাঁড়াল। এখনো তার হাত চিন্ময়ের হাতের মুঠোয় ধরা। ইন্দু

তা ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল না। চিন্ময়ের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'বল কি বলছিলে।'

চিন্ময় বলল, 'আমি সব জানি, আমি সব দেখেছি। এই পীড়নের মধ্যে, নিত্যকার এই অপমান অসম্মানের মধ্যে তোমাকে আমি ফেলে যেতে পারব না। তোমাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।'

ইন্দু ফের একটুকাল স্তব্ধ হয়ে চিন্ময়ের দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হোল সত্যিই বুঝি এতদিনের সব বন্ধন ছিঁড়ে গেল, সমস্ত শিকড় একটানে উন্মূলিত হোল।

কিন্তু পরমুহূর্তে ইন্দু ফের হাসল, 'সঙ্গে নিয়ে যাবে বলছ, কিন্তু কোন দোর দিয়ে বের করবে আমাকে। এ সংসার থেকে বেরোবার রাস্তা তো আমার অত সহজ নয়। বেরোবার সময় যখন আসবে তখন আমি একাই বেরোব।'

চিন্ময় বলল, 'একা ?'

ইন্দু বলল, 'হ্যাঁ একা, যে হাত আমার স্বামী ভেঙে দিয়েছেন সেই হাতই তুমি শক্ত মুঠিতে ধরে রয়েছ। প্রথমটায় বড় যন্ত্রণা পেয়েছিলাম এখন আর অতটা নেই। আর এক জনের ভেঙে দেওয়া হাত তোমার হাতের মধ্যে দেখতে দেখতে আমার কি মনে হচ্ছে জানো ? তোমাদের দুজনের মধ্যে ভারি মিল আছে। সে মিল এতদিন আমার চোখে পড়েনি, আজ পড়েছে। ধর, তুমি যা বলছিলে, সেই অসম্ভব ব্যাপার যদি সম্ভব হয়েই ওঠে, তা হ'লেও কি তুমি যা আছ তাই থাকবে ? না, তুমি আর তখন চিন্ময় থাকবেনা, তখন আস্তে আস্তে তুমিও তোমার অনুপমদা হয়ে দাঁড়াবে।'

চিন্ময়ের মুখ দিয়ে হঠাৎ কোন কথা বেরোলনা।

ইন্দু একটু হাসল, 'আমি তা চাইনে চিন্ময়, আমি তা চাইনে। আমি শুধু চিন্ময়কেই চাই। তুমি আমার কাছে কতটুকু কি পেয়েছ

জানিনে, দেওয়ার মত আমার কিই বা আছে। কিন্তু আমি অনেক শিখেছি, অনেক পেয়েছি। সে শুধু একজনের ভালবাসা পাওয়া নয়, নতুন ক'রে নিজেকে পাওয়া। এতখানি দিয়ে তুমি সেই দান ফিরিয়ে নিওনা চিন্ময়, আমার সব পাওয়া নষ্ট ক'রে দিয়ে যেয়োনা। তুমি চলে যাও।'

ইন্দুর মুখের দিকে আরো একটুকাল তাকিয়ে রইল চিন্ময়। তারপর আস্তে আস্তে ওর হাত ছেড়ে দিল। ইন্দু ফের চলে গেল নিজের ঘরে। গিয়ে জানলার ধারে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

আধঘণ্টা খানেক বাদে হঠাৎ তিলু মিনুর ডাকে ইন্দুর চমক ভাঙল।

মিনু বলল, 'মা জানো চিনুকাকা চলে গেল। দাদার কাছে কতগুলি টাকা দিয়ে গেছে জানো? দাদা বল কিনবে।'

তিলু বলল, 'দুর বোকা মেয়ে। বল কেনার টাকা বুঝি? এ হোলো, এ মাসের ভাড়ার টাকা। এই নাও মা।'

ইন্দু হাত বাড়িয়ে টাকাগুলি তুলে রাখল।

মিনু বলল, 'বেশ মজা হবে দাদা। দুটো ঘরই আবার আমাদের হয়ে যাবে।'

ওরা দুজনেই খুসি হোল। কেউ চিন্ময়কে পছন্দ করেনি। খানিকক্ষণ বাদে অনুপম অফিস থেকে ফিরে এল। আজ একটু তাড়াতাড়িই ফিরেছে। ক্লোজিংএর সময় এলেই রবিবারও অফিস। কিন্তু এ্যাসিষ্ট্যাণ্টদের সব বুঝিয়ে দিয়ে দু'দিন ধরে নিজে আগে আগেই চলে আসছে অনুপম। মন স্থির ক'রে কাজ করবার মত অবস্থা এখন নয়। চিন্ময়কে তাড়িয়ে তিনদিনের কাজ একদিনে সারবে।

ঘরে এসে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে অনুপম স্ত্রীকে ডেকে

বলল, 'ওকি ওখানে অমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছ কেন। শোন এদিকে।'

আরো বার দুই ডাকতে ইন্দু কাছে এসে দাঁড়াল, মৃদুস্বরে বলল, 'কি বলছ।'

অনুপম বলল, 'আসবার সময় নিচে একবার ওর ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে এলাম। ঘরে মানুষজন কেউ আছে বলে তো মনে হোল না। ও গেল কোথায়।'

ইন্দু তেমনি আস্তে আস্তে বলল, 'ও চলে গেছে। ঘর ছেড়ে দিয়ে গেছে।'

অনুপম একটু হাসল, 'বল কি! সত্যি! তখন যে খুব আস্ফালন করছিল। তারপর ভয়ে ভয়ে নিজেই চলে গেল বুঝি।'

ইন্দু বলল, 'আমিই ওকে চলে যেতে বললাম। থাকলে অনর্থক চেঁচামেচি কেলেঙ্কারী হোত। সেদিনের মত—'

অনুপম বলল, 'ঠিক ঠিক, তুমি বুদ্ধিমতীর কাজই করেছ। ওকে তখন ভয় দেখিয়েছিলাম বটে কিন্তু এই নিয়ে পাড়াময় একটা হৈচৈ উঠলে সত্যিই খুব খারাপ হোত। তার চেয়ে ও যে ভালোয় ভালোয় চলে গেছে সেই বেশ হয়েছে। নিরঞ্জনরা বোধহয় কাল সকালেই এসে পড়বে। ওদের খুব গরজ।'

নিচের ঘরে ছেলেদের ছুটোছুটি দাপাদাপির শব্দ শোনা গেল।

তিলু আর মিনু নিচের ঘর দু'টি অনেকদিন বাদে ছাড়া পেয়ে খুব ছুটোছুটি লাফালাফি শুরু করেছে।

অনুপম ভাবল, করুক। কয়েক ঘণ্টার জন্য রাজত্ব পেয়েছে যখন ওরা, ভোগ করে নিক।

একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে দোরটা একটু ভেজিয়ে দিল

অনুপম, তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে স্মিতমুখে বলল, 'সত্যি, ভারি ভালো লাগছে, এত সহজে যে ব্যাপারটা মিটবে—'

ইন্দু কোন জবাব দিল না।

স্ত্রীর শান্ত, গম্ভীর মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটু মুচকি হেসে হঠাৎ স্ত্রীকে পাঁজা কোলে করে তুলে নিল অনুপম। তারপর মুখের কাছে মুখ নিয়ে মিষ্টি ক'রে বলল, 'রাগ করেছ?'

ইন্দু নীরবে স্বামীর দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বলল, 'রাগ কিসের। ছেড়ে দাও, পড়ে যাব।'

অনুপম নিজের মনেই হাসল। ভাবল, মান ভাঙাতে এবার সময় লাগবে। স্ত্রীকে আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বলল, 'আরে না না, পড়বে কেন।'

স্ত্রীর নরম শরীরকে জড়ো করে নিজের বুকের কাছে ধরে রইল অনুপম। তারপর সেই আয়োডেক্সলেপা হাতে চুমু খেল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'জানো, সেদিন যখন অফিসের টিমের হয়ে মাঠে খেলতে নামলাম, গোলে দাঁড়িয়ে ঠিক এমনি করে ধরে রেখেছিলাম বলটাকে। শত চেষ্টা করেও কেউ হাত থেকে আমার বল ফেলে দিতে পারেনি।'

ইন্দু নিঃশ্বাস চেপে বলল, 'ঠিকই বলেছ। আমি তোমার কাছে একটা ফুটবল ছাড়া আর কি?'

অনুপম বলল, 'খেলোয়াড়ের কাছে ফুটবলটা বুঝি কিছু কম হোল? জানো আমি কবিও নই, প্রফেসারও নই, কিন্তু জাত খেলোয়াড়। আমি আমার বলকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসি।'

স্ত্রীকে ঠিক তেমনি ক'রে বুকের কাছে ধ'রে রেখে পশ্চিমের জানলার ধারে এসে দাঁড়াল অনুপম, বলল, 'কি চমৎকার রঙ দেখেছ? গাঁয়ের সেই নদীর পারে সূর্যাস্তের কথা মনে পড়ে তাই না?'